

## কথামৃত – অষ্টম পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita  
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math  
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীযুক্ত রাখাল,  
প্রাণকৃষ্ণ, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার প্রভৃতির সঙ্গে

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন। শীতকাল –পৌষ মাস, ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩ (পৃঃ ১৩০)। ঠাকুরের কথা মাস্টারমশাই অনেকদিন ধরে অনুলিখন করে যাচ্ছেন। ইংরাজী বছরের প্রথম দিন, অনেকের সমাগম হয়েছে। আজকের আলোচনায় প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন ভক্তের কথাবার্তা এসেছে। প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কর্মস্থান ও বাসস্থান নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শরীরটা স্থূল হওয়ার জন্য ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণকে মোটা বামুন বলে সম্বোধন করতেন। বলছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণকৃষ্ণ বড় ভক্তি করেন।

ঠাকুর মেঝেতে বসিয়া আছেন। কাছে এক চ্যাংড়া জিলিপি –কোন ভক্ত আনিয়াছেন। তিনি একটু জিলিপি ভাঙিয়া খাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি সহাস্যে) –দেখছ আমি মায়ের নাম করি বলে –এই সব জিনিস খেতে পাচ্ছি। (হাস্য) ঠাকুর মজার ছলে বলছেন। গীতাতে ভগবান বলছেন, যোগক্ষেমং বহাম্যহম্, ভক্তের যা কিছু দরকার হয়, ভগবান নিজে বয়ে নিয়ে আসেন। সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্তদের যে ছোটখাট ইচ্ছা থাকে, ভগবান সত্যিকারের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন। ভগবান কি দেন? গীতাতে এই যে ভগবান বলছেন, যোগক্ষেমং, এটাই হল ঠিক ঠিক বর্ণনা –ভগবান কি দেন। ঠাকুরে যে বলছেন, আমি মায়ের নাম করি বলে, এ-সব জিনিস খেতে পাচ্ছি, এগুলোও যোগক্ষেমের মধ্যেই পড়ে। আমাদের সমস্যা হল, আমরা যোগক্ষেম চাই না, আমরা চাইছি ভোগ। ভক্তি আর ভোগ দুটো একসাথে চলে না। ভক্তরা প্রায়ই প্রশ্ন করেন, ‘ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, কিছুই তো হল না’। না হওয়ারই কথা। ঠাকুর বিধান করে দিয়েছেন, এই জগৎটা কর্মফলের দ্বারা চলবে, যেমনটি তুমি কর্ম করবে, সেই অনুসারে তুমি তেমনটি ফল পাবে। এটা শুধু যে কয়েকজনের জন্য তা না, সবারই ক্ষেত্রে এই বিধি সমান ভাবে প্রযোজ্য। বেদান্ত মতে বলেন, যাঁরা আত্মজ্ঞান পেয়েছেন, তাঁদেরও যে কর্মের জন্য শরীরধারণ, জ্ঞানলাভের পর সেই কর্ম চলতে থাকে, তবে জ্ঞানী তাতে আবদ্ধ হন না। গীতা বলছেন, কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, ইচ্ছা রাখতে নেই। তবে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা, শাস্ত্র পড়ার ইচ্ছা, ইচ্ছার মধ্যে পড়ে না।

আপনার, আমার মনের ইচ্ছাগুলি, চাহিদাগুলিকে পরিষ্কার তিনটে শ্রেণীতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে –একটা হল সংসারে ভোগের ইচ্ছা। ঠাকুরের ভাষায় কামিনী-কাঞ্চন, শাস্ত্রের ভাষায় পুত্রৈষণা, বিবৈষণা ও লোকৈষণা। পুত্রের ইচ্ছা, প্রচুর টাকা-পয়সার ইচ্ছা ও মৃত্যুর পর ভাল লোকে যাওয়ার ইচ্ছা। এই তিনটে কি? কথামৃতে ঠাকুর ষড়রিপুর কথা অনেকবার বলেছেন –কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য, এর মধ্যেই মনটা ঘুরঘুর করতে থাকে। এটা আমাদের ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার –যদি আমরা ঠাকুরের ভক্ত হই, যদি কেউ মনে করে তার মধ্যে ঠাকুরকে পাওয়ার একটু ইচ্ছা জেগেছে, ঠাকুর কিন্তু সেটা পূর্ণ করবেন না। শুধু পূর্ণই করবেন না, এটা নিশ্চিত করে দেবেন যে আপনি এটা পেতে পারেন না। ভগবান যখন জেনে যান, এ আমার ভক্ত, আমাকে চাইছে; তখন ভগবান সেই ভক্তকে সংসার থেকে বার করার জন্য হনুমানজীর মত লঙ্কাদহন শুরু করে দেন। হনুমানের মত গদা

চালিয়ে আমরা যে রাজমহলে আছি, সেই রাজমহলটা ভেঙে গুড়িয়ে দেবেন, সুখের সংসারটা চুরমার করে দেবেন, কারণ তিনি তাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। ঠাকুর নিজেই বলছেন, কত সাধ ছিল, সব গেল। মা কালীর প্রতি এমন ভালবাসা হয়ে গেল যে, তাঁর সব সাধ চলে গেল। শুধু ঠাকুরের না, আপনার আমার সবাই যাবে। ঠাকুরকে একবার যে ভালবেসেছে, তার সব যাবে, কিছু থাকবে না।

এখানে যে ভোগের ইচ্ছা বলছেন, ঠাকুরের কথায় কামিনী-কাঞ্চন, উপনিষদের কথায় পুত্রৈষণা; বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা আর ষড়রিপুর দিক থেকে কাম, ক্রোধ, লোভাদি; এই ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হয় না। বেদ কাম্যকর্ম সম্বন্ধে বলছেন; আপনি ঠাকুরের নিত্যপূজা করতে চান, এটা কাম্যকর্মের মধ্যে আসবে না, এটা নিত্যকর্ম। ঈশ্বরজ্ঞান হয়ে গেলে এই নিত্যকর্ম সব খসে পড়ে যায়, কারণ সর্বত্র ঈশ্বর দেখছেন, তখন আর কাকে পূজা করবেন। এটা হল প্রথম শ্রেণী; দ্বিতীয় শ্রেণী হল—আপনি মোক্ষপথে চলতে শুরু করেছেন; আপনার অজান্তায় মনটা কামিনী-কাঞ্চন, ভোগ, নামযশ এগুলোর কোথাও একটু আটকে গেছে। এখানে ঠাকুর অবশ্যই আপনাকে দেবেন। এটাকেই বলে যোগক্ষেম্। ওটা না পেলে মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকবে।

ঠাকুর দেবেন ঠিকই, কিন্তু তার জন্য মূল্যটা আপনাকে দিতে হবে। মূল্যটা অত্যন্ত বাজে। মহাভারতে দেখবেন, সেখানে ঋষিরা থেকে থেকে বলছেন, আমি চাইলে এটা করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে আমার তপস্যার ফল নষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, আমি চাইলে সমস্ত রাক্ষসকে শেষ করে দিতে পারি, কিন্তু মাঝখান থেকে আমার তপস্যার ফলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার মনে যখনই কোন কামিনী-কাঞ্চন, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, কাম, ক্রোধ, লোভাদি সম্পর্কিত কোন ইচ্ছা যদি জাগে, আপনি এটা পাবেনই পাবেন, বদলে আপনার তপস্যার ফলটা চলে যাবে। আপনার কেউ ক্ষতি করছে বলে রেগে গেছেন, যদি ভক্ত হয়ে থাকেন আপনার ক্রোধরূপী বাণ তার লাগবেই লাগবে, মাঝখান থেকে আপনার তপস্যার ফলটা চলে যাবে। যেমন যেমন আধ্যাত্মিক পথে এগোতে শুরু করে, তেমন তেমন এই ইচ্ছাগুলো কমে যায়।

তৃতীয় হল, পুরো সাধনা সম্পর্কিত ইচ্ছা। সেটা কি রকম? আমি জপধ্যান করতে চাই, আমি ঠাকুরের সামনে বসে থাকতে চাই, আমি ধ্যানে ডুবে থাকতে চাই। এগুলো হল যাদের প্রথম ধাপে যেটা বলা হল, ভোগের বাসনাগুলো কেটে গেছে, দ্বিতীয় যাদের এগুলো খুব অল্প একটু থাকে। তৃতীয় ধাপে যেখানে মনটা পুরোপুরি ডুবে গেছে, সেখানে এই ধরণের কামনাগুলো কামনার মধ্যে পড়ে না। ঠাকুর যেমন বলছেন, যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। কেন? কামনা মানেই আমার যেটা নেই, সেটা আমি পেতে চাইছি। এবার আমি সাধন-ভজন করতে চাইছি; বলছি, আমি যেটা আমি সেটা হতে চাইছি। তাহলে তো এটা কামনার মধ্যে এলো না। আমি যেটা আমি সেটা হতে চাইছি। আপনি যেটা সেটা যদি আপনি চান, তাহলে সেটা কামনার মধ্যে কি করে পড়বে? কারণ প্রথম থেকে কামনা বলতে এটাই বোঝায়, যেটা আমার নেই বা আমি যেটা নই, আমি সেটা পেতে চাইছি। যেমন সন্তান চাইছেন, আপনি তো সন্তান নন। আপনার সন্তান নেই, সন্তান পাওয়ার জন্য আপনাকে একজন নারীকে স্ত্রী করে আনতে হবে, কিংবা স্বামী জোগাড় করতে হবে। এরপর গৃহস্থ কার্যে নেমে সেখান থেকে সন্তান পেতে হবে। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আপনি যেটা সেটাকে জানার জন্য আপনাকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। তাহলে ভগবান ঠিক ঠিক কোন ইচ্ছা পূর্ণ করেন? ত্যাগের। ত্যাগ সম্পর্কিত যে কোন ইচ্ছা ভগবান পূরণ করবেন।

আপনি চাইছেন সকালে উঠে ঠাকুরের নাম করব, কিন্তু সকালে উঠতে পারছেন না। আপনি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন, এক মাস, দু মাস, ছ মাস, এক বছর, দু বছর প্রার্থনা করতে থাকুন—হে ঠাকুর তমোগুণের প্রভাবে আমার মধ্যে যে ঘুম থেকে না ওঠার ইচ্ছা, এই তমোগুণটা যেন চলে

যায়। ভগবান আমাদের কাছে ত্যাগ চাইছেন। এখানে আপনি এমন কোন জিনিস চাইছেন না, যেটা আপনার না। আপনি যেটা, আপনি সেটা হতে চাইছেন, এই প্রার্থনা পূর্ণ হতে বেশি দেরী হয় না।

তার মানে চাহিদার পুরোপুরি তিনটে ক্যাটাগরি হয়ে যায়। ভক্ত হলে আপনার প্রথমটা হবে না, যদি হয় সেটার জন্য আপনাকে খাটতে হবে। আপনি যত বড় ভক্তই হন, আপনি যদি কোটিপতি হতে চান, কোটিপতি হওয়ার জন্য আপনাকে সেই অনুপাতে খাটতে হবে। ওটা উনি কাউকে দেবেন না। ছোটখাট যে ইচ্ছাগুলি থাকে, তা তিনি ভক্ত হন, কি সন্ন্যাসী হন, কি সাধক হন, এনাদের সেগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যতটুকু তিনি দেবেন, ততটুকু তপস্যার ফল নিয়ে নেবেন। কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, তাই ওটা নেবেনই। আপনি নিজে যেটা, সেটা যদি হতে চান; ওটার জন্য কোন মূল্য চোকাতে হয় না। মনে হয়, মূল্য দিতে হচ্ছে, আসলে মূল্য দিতে হয় না। কি মূল্য? কামনার যে জগৎ, ভোগের যে জগৎ, এটা খসে পড়ে যায়। আপনি তো ওটার জন্যই প্রার্থনা করছেন, যাতে এগুলো খসে পড়ে যায়। প্রাণকৃষ্ণের মাধ্যমে ঠাকুর সবাইকে এটাই বলছেন, মায়ের নাম যদি করেন, ভগবানের নাম যদি করেন, দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো যা দরকার, তিনি দিয়ে দেন। আমাদের সাধুদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, কোন সাধুর মনে যদি কোন ইচ্ছা জাগে, ছোটখাটো হলে মিটে যায়; বড় হলে বিপজ্জনক। কোথায় ফেঁসে যাবে কোন ঠিক নেই, কারণ একটা মূল্য তো দিতে হবে। সাধারণ মুদি দোকানেই যাই, বড় মলেই যাই, যেখানেই যাই না কেন; কোন জিনিস কিনলে সেটার জন্য একটা মূল্য দিতে হবে। ঠিক তেমনি, এই সংসারে যে কোন জিনিস পেতে গেলে মূল্য দিতে হবে।

ঠাকুর কখনই চান না যে, আমার যে আপন লোক, আমার যে ভক্ত, সে এই জগতে ফেঁসে যাক; তিনি চান না তার আধ্যাত্মিক পথে চলার ক্ষেত্রে কোন বিষয় আসুক, তিনি এটা কাটিয়ে দেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে তিলক কাটা, গলায় কণ্ঠি নেওয়া, এগুলো থাকলে বলে মার্কামারা বৈষ্ণব। আপনি যেমনি ঠাকুরের মন্ত্র নিলেন, ঠাকুরের দিকে যেমনি এগোতে শুরু করলেন, আপনি ঠাকুরের মার্কামারা হয়ে গেলেন, ঠাকুরের স্ট্যাম্প পড়ে গেল আপনার উপর। এটাকেই ঠাকুর আরও সহজ ভাষায় বলছেন—হাসপাতালে নাম লেখালে যতক্ষণ রোগের কসুর না হয় ততক্ষণ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে না। ঠিক তেমনি, এই পথে পা রেখেছেন কি, এরপর আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঠাকুর আর তাঁকে ছাড়বেন না। প্রাণকৃষ্ণের মাধ্যমে ঠাকুর সবাইকে এটাই বলছেন, এই যে ছোটখাটো ইচ্ছাগুলো হয়, এগুলো সঙ্গে সঙ্গে মিটে যায়।

**কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না—তিনি অমৃত ফল দেন—জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য।** ঠাকুর এই একটি বাক্যে চারটি শব্দ বলছেন—জ্ঞান, প্রেম, বিবেক ও বৈরাগ্য। এই চারটে শব্দকে আপনি নিজের মত ব্যাখ্যা করে নিতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন, জ্ঞান, প্রেম, বিবেক ও বৈরাগ্য, এই চারটির সম্পর্কিত যে কোন প্রার্থনা আপনার পূর্ণ হয়ে যাবে। রাজযোগে খুব সুন্দর বলছেন—পুরুষ আর প্রকৃতিকে তফাৎ করে দেওয়া নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন, প্রকৃতির এলাকার যা কিছু আছে তার কোনটাই ভগবান দেবেন না। প্রকৃতির এলাকার কিছু পেতে গেলে সবাইকে কর্ম করতে হবে, কর্মের মাধ্যমেই পেতে হবে।

রামচরিতমানসে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, বাল্মীকি রামায়ণেও আছে, কিন্তু তুলসীদাসের বর্ণনা খুব সুন্দর। মহাবীর হনুমান লক্ষ্ম দিয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে লঙ্কায় যাচ্ছেন। দেবতারা পরীক্ষা নিতে গেলেন, হনুমান রামের কাজ সমাধা করে ফিরে আসতে পারবে কি পারবে না। একটা বিচিত্র জীব তৈরী করে নিয়ে আসা হল, যার নাম সুরসা, সমুদ্রের এক রাক্ষসী। সুরসা মুখের ব্যাদান বড় করছে আর বলছে, ‘দেবতারা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমার পথে যে আসবে তাকে আমার ভিতরে চলে আসতে হবে’। হনুমানও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তিনি নিজের শরীরের কলেবর বাড়াতে শুরু করে দিলেন। অনিমা, লঘিমা, গরিমা এগুলো যোগশক্তি; মহাবীর হনুমানের মধ্যে সমস্ত যোগশক্তি আছে। মহাবীর হনুমান

নিজেকে বিশাল করে নিয়েছেন দেখে সুরসাও নিজের মুখটাকে আরও বড় করে দিয়েছে। হনুমান যত বাড়ায় সুরসাও তত মুখটা বড় করতে থাকছে। শেষ বড় হতে হতে হঠাৎ মহাবীর হনুমান একটা ছোট্ট মাছি হয়ে সুরসার মুখে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে এসেছেন। সুরসার বিশাল মুখ যতক্ষণে বন্ধ করবে ততক্ষণে হনুমান বেরিয়ে এসেছেন। দেবতারা হনুমানের সাংঘাতিক উপস্থিত বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেছেন। যাঁরাই সাধক, আপনিই হন বা আমিই হই, সবাইকে ঠাকুর হনুমানজীর মত সুরসার মুখের দিকে ঠিক এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যান। একটু ছুঁয়ে দেখিয়ে দেন; দেখ, এটা এই রকম। অতটুকু না দেখে নিলে মনটা ছটফট করতে থাকে, লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারে না।

ঠাকুর এই জিনিসটাকে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করছেন, যেমন, ছেলে মাকে বিরক্ত করে যাচ্ছে, দুটো পয়সা চাইছে, ঘুড়ি কিনবে। আগেকার দিনে আমরা যদি জেদ করতাম, বড়রা দিতেন না। মা যদি বুঝে নেন, না দিলে ছাড়বে না, তখন হয়ত দিয়ে দিতেন, কিন্তু তার সাথে দুটো চড় মেয়ে দিতেন। এখন অবশ্য এগুলো কল্পনাই করা যায় না। ঠাকুরও এই রকমই করেন। প্রকৃতির এলাকায় যা কিছু ভোগ্য উপকরণ আছে, তার কোন একটা কিছু যদি চান, তিনি দেবেন, এবং একটা চড়ও মারবেন।

অমৃত ফল—জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য; এটা তো আপনার স্বরূপ। রাজযোগে যে পুরুষের কথা বলছেন, বেদান্ত যে আত্মার বর্ণনা করছেন; এটাই তো আমার স্বরূপ, এটা চাইলেই আপনি পাবেন, তবে চেষ্টা করতে হবে, লেগে থাকতে হবে। আমি আজ পর্যন্ত কোন শ্রোতা পাইনি, কোন ভক্ত পাইনি, যে মুখে বলে না যে এটা আমার চাই। কিন্তু এত সহজ কি? সংসার ত্যাগ করা কি এত সহজ? আমরা সন্ন্যাসী আমরা জানি কি কষ্ট। হাজারটা জিনিস যে খসে পড়ে গেছে, সেটা আমাদের সৌভাগ্য; কিন্তু পাঁচটা জিনিস এখনও যে আছে, সেগুলো সব সময় তৈরী হয়ে আছে, কখন যে হুকে গিয়ে আটকে যাবে আর টেনে ভোগে নামিয়ে আনবে, সেইজন্য সব সময় আমরা সন্ন্যাসীরা আতঙ্কে থাকি। যার জন্য বলা হয়ে থাকে—পুড়বে সাধু উড়বে ছাই, তবে তার গুণ গাই। কোন ঠিক নেই কিনা, কোথাও গিয়ে হুকটা আটকে যাবে কেউ জানি না।

এরপর মাস্টারমশাই খুব সুন্দর একটা দৃশ্যের ছবি আঁকছেন। সেই সময় ঘরে একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করেছে। ঠাকুর ওই বাচ্চাকে দেখে বালকবৎ হয়ে গেলেন। বাচ্চা যেমন নিজের খেলনা, নিজের লজ্জাপত্র লুকিয়ে বেড়ায়, পাছে ওর সমবয়সী বন্ধুরা দেখতে পায়। বর্ণনা করছেন— একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখে—পাছে সে খাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও সেই অপূর্ব বালকবৎ অবস্থা হইতেছে। তিনি জিলিপির চ্যাংড়াটি হাত ঢাকা দিয়া লুকাইতেছেন। ক্রমে তিনি চ্যাংড়াটি একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়ে দিলেন। ঠাকুর এখন পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চা ছেলের যে ভাব, সেই ভাবের গভীরে চলে গেছেন। ঠাকুর অনেকবার বলছেন, বাচ্চারা হল ত্রিগুণাতীত, সত্ত্ব, রজো, তমো তিনটে গুণের পারে। যাঁরা এই রকম সর্বদা অন্তর্জগতের গভীরে বিচরণ করেন, বহির্জগতে কোন কিছু দেখলে তাঁদের ভিতরে একটা ভাবের উদয় হয়। আমার নিজের একটা মজার ঘটনা আছে, অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। অনেক বছর আগে আমি অমরনাথ যাত্রাতে গিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করলাম, অমরনাথ যাত্রার আগে বৈষ্ণোদেবীর দর্শন করতে যাব। ওইদিকের লোকেরা ঠাকুরকে তেমন জানে না। হাঁটতে শুরু করেছি, হঠাৎ দেখছি একটা পাথরের ঘুপটি, দেখছি ওর ভিতরে ঠাকুরের একটা ছবি লাগানো আছে। ওটা দেখে ভিতরে ঠাকুরের এমন প্রবল ভাব এলো, বেলুড় মঠের মন্দিরে গিয়েও অত ভাব হয় না; হয়, অনেকদিন বাইরে থেকে ঘোরাঘুরি করে এসে ঠাকুরের সামনে দাঁড়ালে তখন ভাবের উচ্ছ্বাস হয়। তখন প্রথম আমার মাথায় এটাই এলো, ঠাকুর কোন একটা জিনিসকে চিন্তা করলে ঠিক এ-ভাবেই ওনার উচ্ছ্বাসটা আসত, মনটা একটা বিষয়ে গিয়ে ডুবে যেত। এখানে বালক দেখছেন, নিজেকেও বালক মনে করছেন। তবে বলা মুশকিল তখন ঠাকুর ত্রিগুণাতীতের ভাব বা কৃষ্ণের ভাব, কোন ভাবে চলে গিয়েছিলেন আমরা জানি না।

প্রাণকৃষ্ণ গৃহস্থ বটেন, কিন্তু তিনি বেদান্তচর্চা করেন –বলেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, তিনিই আমি –সোহমম। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ –কলিতে নারদীয় ভক্তি। এটাই পথ। অনেকে প্রশ্ন করেন ধ্যান করলে কি হবে না? না, আপনাদের জন্য ধ্যানপথ নয়। ধ্যানের জন্য যে প্রস্তুতি লাগে, সেটা বিরাট। ওই স্তরে আপনারা এখন যেতে পারবেন না, আমরাই সাহস পাইনা। আমাদের জন্য ভক্তি পথ, গুরু যা বলে দিয়েছেন, যতটুকু বলে দিয়েছেন, যেভাবে করতে বলেছেন, ওটাই পথ। তবে এগুলো জানতে হয়, জেনে রাখা ভাল। আজেবাজে সিরিয়াল, আজেবাজে কাজ, আজেবেজে কথাবার্তার মধ্যে না থেকে একটা শুভ চিন্তা, সৎচিন্তা নিয়ে থাকলেন।

বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়া মিষ্টান্ন লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভাবলে কেমন অবাক লাগে। প্রাণকৃষ্ণ সামনে বসে আছে, কথা হচ্ছে, অতি সাধারণ একটা পরিস্থিতি, ঠাকুর তাতেই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। মাস্টারমশাই এই আলোচনাটাকে এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নিয়ে যাচ্ছেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ভাবরাজ্য ও রূপদর্শন

মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন – ঠাকুর সমাধিস্থ –অনেকক্ষণ ভাববিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। দেহ নড়িতেছে না –চক্ষু স্পন্দহীন –নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা –বুঝা যায় না।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন – যেন ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন। ঠাকুরের জীবনী বা লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের যে জীবনী আমরা পাই, তাতে দেখা যায়, ওনার কাছে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা নিয়ে যাঁরা আসতেন তাঁদের ভাব তিনি বুঝতে পারতেন। তার থেকেও বেশী কার জন্য কোনটা বেশি দরকার সেটাও বুঝতে পারতেন। শুধু যে ওর মনে কি আছে বুঝতে পারতেন তা না, সাথে সাথে ওর জন্য কোনটা ভাল সেটাও বুঝতে পারতেন। যাঁদের অন্তরের ভাব আর মনের ভাবে মিল পেতেন, তাঁদের ঠাকুর উৎসাহ দিয়ে ওই পথে নিয়ে চলে যেতেন। এই দুটোর মধ্যে যাঁদের অমিল দেখতেন, ঠাকুর ওই অমিলটা ঠিক করে দিতেন। এখানে প্রাণকৃষ্ণের অন্তরের ভাব আর মনের ভাবে অমিল। কেন অমিল? তিনি চাকরি করেন, বিবাহ করেছেন। সন্তান না হওয়ার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছেন। তার মানে, মনে যে সন্তানের কামনা, উপনিষদে যাকে *পুত্রৈষণা* বলা হচ্ছে, এই এষণাটা খুব প্রবল। আর যার মনে *পুত্রৈষণা* আছে তার মধ্যে *বিত্তৈষণা* থাকবেই। পুত্র, বিত্ত যাদের এসে যায়, তাদের মনে *লোকৈষণা* থাকবেই, এদের জন্য বেদান্ত নয়। আগে আমরা যে দুর্বলতার আলোচনা করছিলাম, আপনার অল্প একটু দুর্বলতা আছে, সেটা অন্য জিনিস। প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞান আছে ঠিকই, এটা কিন্তু দুর্বলতা না, তাঁর মধ্যে তিনটে এষণাই পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। ঠাকুরকে তিনি ভক্তি করেন, ঠাকুর তাঁকে কড়া কথা বলবেন না, কিন্তু খুব সহজ ভাবে তাঁকে পথে নিয়ে আসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) –তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার। এটাই বেদান্তের মত, আচার্য শঙ্কর বারবার এই মতের কথাই বলছেন –যিনি ব্রহ্ম তিনিই বাসুদেব, তিনিই কৃষ্ণ হয়ে জন্ম নিয়েছেন। তাঁর রূপ দর্শন করা যায়। ভাব-ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করা যায়। মা নানারূপে দর্শন দেন। এই কথা বলে তিনি কয়েকটা দর্শনের বর্ণনা করছেন। ঠাকুর যে মা কালীর রূপ দর্শন করেছেন তা না, তিনি অন্যান্য দেবীদেবতাদের রূপও দর্শন করেছেন; শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে অনেকবার দর্শন করেছেন। আমি এখানে আমার বুদ্ধির মত ব্যাখ্যা করছি, আপনি এটা আপনার বুদ্ধির মত নেবেন। আসলে জিনিসটা কি, আমরা জানি না। আমরা সাধুসঙ্গ করেছি, ওনারা তপস্বী ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন; তাঁদেরকে প্রশ্ন করেছি, তাঁদের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি, চিন্তন-মনন করেছি। কিন্তু যাই করে থাকি না কেন, যে ব্যাখ্যাটা করছি, এটা আমার বুদ্ধি থেকে আসছে। আমার মন যতটা অশুদ্ধ, উত্তর ততটাই অশুদ্ধ হবে, এতটুকু বুঝে নিয়ে আপনি মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন।

কাল মাকে দেখলাম। গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নাই। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন। আজকে বলছেন, কাল মাকে দেখলাম, একদিন আগের কথা। ভাবা যায়! কেমন অবাক লাগে, এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির, সেখানে ঠাকুর আর মা কালী, সাক্ষাৎ কথাবার্তা হচ্ছে। ১৮৮৩ সাল, যে ঘরে বসে ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলছেন, তার পাশেই তিনি মাকে দেখেছেন, মা কালী গেরুয়া জামা পরা, সেলাই নেই। মা কালীকে আমরা দিগম্বরী মনে করি, তিনি আবার গেরুয়া জামা পরে এসেছেন। রোমা রোঁলা ঠাকুরের জীবনী লিখলেন। ওনার এক বোন ছিল। বোনের ইচ্ছে হয়েছিল ভারত সম্বন্ধে জানবার। তিনি লাইব্রেরীতে স্বামীজীর একটা বই পেলেন। তিনি পড়ার পর তো রীতিমত চমকে উঠেছেন, ভাইকে খবর দিলেন। রোমা রোঁলাও পড়ে অবাক, আমি কি পড়ছি! তারপরই তিনি ঠাকুর, স্বামীজী নিয়ে প্রচুর গবেষণা শুরু করেন। এরপর ফরাসী ভাষায় রচনা করলেন –The Life of Sri Ramakrishna। বইটাতে প্রচুর ফুটনোটস, ফুটনোটস না হলে আমরা বুঝতেই পারব না, western perspective থেকে লেখা কিনা। কি অপূর্ব বই, সাহিত্যিক কিনা; সুযোগ পেলে অবশ্যই পড়বেন। তিনি এই ঘটনাগুলির যখন বর্ণনা করছেন, সেখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলছেন –এগুলো কি বিশ্বাস করা যায়? এ আমরা কোন যুগে বিচরণ করছি। রোমা রোঁলার কাছে অবাক লাগছে এটাই যে, এই কথাগুলো দু-হাজার বছর আগেকার হলে লোকেরা মেনে নিত, বিশ্বাস করত। কিন্তু এতো কালকের কথা। রোমা রোঁলা যখন লিখছেন ১৯১৯ কি ১৯২০ ওই সময়ে। ঠাকুরের শরীর গেছে, তারও পঞ্চাশ বছর হয়নি। গতকালের কথা, অবাক লাগে শুনতে। ঠাকুরের সাধনার সময়েও না, দেহত্যাগের দুদিন আগেও মা-কালীকে দেখছেন, ঠাকুর সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

আর-একদিন মুসলমানের মেয়েরূপে আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। হয় সাত বছরের মেয়ে –আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগল ও ফচকিমি করতে লাগল।

হৃদের বাড়িতে যখন ছিলাম –গৌরান্দর্শন হয়েছিল –কালপেড়ে কাপড় পরা।

হলধারী বলত তিনি ভাব-অভাবের অতীত। এই যে মা-কে দেখছেন, কখন গেরুয়া পরা, পরে আবার বলবেন, রতির মার বেশে, আবার মুসলমানের মেয়েরূপে। হয় তিনি সাধারণ মুসলমান মেয়ের কথা বলছেন বা কোন একজন মুসলমানের কথা তিনি বলছেন, যার একটা মেয়ে ছিল, সেই মেয়ের কথা বলছেন। জিনিসটা কি? আর তিনি জানলেনই বা কি করে যে, এ মুসলমানের মেয়ে? যদি মেয়েটি তাঁর জানাশোনা কোন মুসলমানের মেয়ে হয়, তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু এখানে পড়ে সেটা বোঝা যায় না। মনে হয় মেয়েটি মুসলমান, আবার তিলক কাটা। স্বপ্নে যেমন কোন জিনিসকে দেখলে আমরা বুঝে নিই, এটা এই, এটা অমুক লোক। স্বপ্নে যাকে দেখছি সে কিন্তু স্বপ্নে সে-রকমই হয় না। ছবিতে যেমন মিল থাকে, স্বপ্নে তেমন মিল থাকে না। হঠাৎ আপনার বন্ধুকে দেখছেন দৌড়ে আসছে, তারপর দেখলেন সে বাঘ হয়ে গেছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই আপনি তাকে বলছেন, ‘আরে কাল স্বপ্ন দেখলাম তুমি বাঘ হয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ’। কি করে জানলেন যে, ওই বাঘ আপনার বন্ধু? আপনার মন আপনাকে এটা বলে দেয়। সবটাই মনের, এই বন্ধনটাও মনের, মুক্তিটাও মনের। এই যে দর্শনগুলি হয়, এগুলোও মনের। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, আমাদের মন অশুদ্ধ, আমাদের মন বিষয়াসক্ত, কামিনী-কাঞ্চনে মনটা ডুবে আছে। সেইজন্য আমরা জিনিসগুলিকে কখন ঠিক জানি, কখন ভুল জানি। স্বপ্ন যখন দেখছি, তখনও ঠিক-ভুল, ভুল-ঠিক মিলিয়ে মিশিয়ে দেখতে থাকি। ঠাকুরের মন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র মন। এই যা কিছু ঠাকুর দেখছেন, এগুলো তিনি স্বপ্ন দেখছেন না, ভাবে সব দেখছেন।

স্বপ্ন আর ভাবের মধ্যে কি তফাৎ? আমরা যে এই স্থূল জগতে বাস করি, এটা একটা জগৎ। কিন্তু এই জগৎ স্থূল জগৎ মাত্র। স্বামীজীও বর্ণনা করছেন, স্থূল জগতের পিছনে আছে মনের জগৎ। আসলে স্থূল জগৎটাও মনেরই জগৎ, কিন্তু খুব স্থূল রূপে এই জগৎকে দেখায়। মনের জগৎ যেন আরও সূক্ষ্ম জগৎ, সেখানে আরও সব সূক্ষ্ম জগৎ আছে। স্বামীজী এগুলোকে সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, দ্যুলোক,

ব্রহ্মলোক এভাবে বর্ণনা করছেন। বিভিন্ন লোকের বর্ণনা, এটা আমাদের পুরাণেরই কথা, কিন্তু স্বামীজী নিজের মত করে বর্ণনা করেছেন। সূর্যলোকে বস্তু আর শক্তি পুরো আলাদা, যেখানে আইনস্টাইনের ইকুয়েশন  $E=MC^2$  চলে। তার পিছনে যে লোকগুলো আছে, সেখানে বস্তু আর শক্তি আস্তে আস্তে মিলিত হতে থাকে। ওটা হল দেবতাদের জায়গা। মৃত্যুর পরে স্থূল শরীরের পতন হয়ে যাওয়ার পর আমাদের জীবাত্তা স্থূল দেহ থেকে মুক্ত হয়ে তার যেমন জ্ঞান উপলব্ধি, যেমন কর্ম, সেই অনুসারে বিভিন্ন লোকে চলে যায়। খুব ভাল জ্ঞান ও কর্ম যদি না থাকে, তাহলে এখানেই কিছু দিন ঘুরঘুর করে একটা নূতন স্থূল শরীরে প্রবেশ করে যায়। অন্য রকম যদি কর্ম থাকে, তাহলে সে সূক্ষ্ম জগতে যায়, দেবতাদের জগতে বা পিতৃদের জগতে যায়। সেখানে যখন তার কর্ম শেষ হয়, সেখান থেকে আরেকটা জগতে যায়। এই পরিক্রমণ অনবরত চলেছে, শান্তিতে কেউ নেই। কোথাও কিছু স্থির নেই। দেবার্ষি নারদ যেমন চলছেন তো চলছেনই, কোথাও স্থির থাকেন না, আমরাও তাই, আমরা কখন স্থির থাকি না। এই যে জগৎগুলি আছে, যে জিনিসটা মৃত্যুর পরে জানা যায়, সেটাকেই কিন্তু ধ্যানের অবস্থায় জানা যায়। রাজযোগে যেখানে সিদ্ধির কথা বলা হয়েছেন, সেখানে ঠিক এই জিনিসটার বর্ণনা আছে।

যখন আমরা ধ্যান করছি, তখন মন আমাদের শুদ্ধ হচ্ছে। মন যত শুদ্ধ হয়, তত বিভিন্ন লোকের অবস্থাগুলো জানা যায়। তফাৎ হল, মানুষ মৃত্যুর পর যখন একটা লোকে যায়, সেখানে সে আবদ্ধ থাকে, সেখান থেকে সে বেরোতে পারে না। যোগী এই জিনিসটাকে জয় করে নেন, জয় করে নেওয়ার ফলে তিনি এর মধ্যে বাচ খেলেন। তিনি এখন এই লোকে আছেন, আবার তখনই অন্য কোন লোকে চলে গেলেন; পরিষ্কার তিনি দেখতে পান, আমি এখন এই লোকে আছি। তার সাথে সেই লোকের যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাও তাঁর এসে যায়। অনেকে যেমন বলেন, তার ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে, তার মায়ের দর্শন হচ্ছে—এগুলো সবই হল পাগলামোর লক্ষণ। কেন পাগলামো বলা হচ্ছে? যদি ঠাকুর বা মায়ের আপনার দর্শন হয়, তাহলে ঠাকুর ও মা যে লোকে বাস করেন, সেই লোকে আপনি বাচ খেলা করছেন। তার মানে ঠাকুরের লোকে গিয়ে আপনি আবার ফেরৎ আসতে পারছেন। ঠাকুরের দর্শন হলে আপনার ওই লোকের ক্ষমতাটাও থাকবে। যেমন ধরুন সূক্ষ্মতর লোক বৈকুণ্ঠলোকের নিবাসীদের যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা আপনার এই লোকেই এসে যাবে। যোগীদের ক্ষমতার যে কথা বলা হয়, যোগসিদ্ধির যে কথা বলা হয়, হনুমানজীর অনিমা, লঘিমার কথা যেগুলো আগে বললাম, এই ক্ষমতাগুলো এখানেই এসে যায়। ঠাকুর যখন এগুলো দেখছেন, ঠাকুরের মন এত শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছে যে, যে কোন সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দারা যখন তাঁরা সামনে এসে যাবেন এবং তাঁর মন সেখানে পৌঁছে যাবে, আর তিনি পরিষ্কার সব কিছু দেখতে পারবেন, তা সে চর্মচক্ষু দিয়েই হোক, আর যে চোখেই হোক, দেখতে তিনি পারবেন, এবং সব স্পষ্ট। আপনার মন বলে দেবে, আপনি কাকে দেখছেন।

তাহলে ঠাকুরের এই দর্শনগুলো কেন সত্য, আমারটা কেন সত্য না? শক্তি বিশেষের তফাৎ দিয়ে বোঝা যাবে। যদি আপনার ওই লোক সম্পর্কিত যে শক্তি থাকে; যেমন ধরুন, আমরা জানি স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদি দেবতারা আছেন, সেখানে দেবতাদের বিশেষ শক্তিগুলি আছে, তিনি আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেন, তিনি আমাদের ভাগ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। যাঁরা ধ্যান করে দেবলোকে আসা-যাওয়া করতে পারেন, তাঁদের ওই শক্তিটা এসে যায়।

সূক্ষ্ম জগতের পিছনে আছে কারণ জগৎ। কারণ জগৎ হল, যেখানে সেই আত্মার উপর একটা ক্ষীণ আবরণ রয়েছে, এটা ঈশ্বরের জগৎ। যাঁরা কারণ জগতে যান, তাঁরা ওখানে লয় হয়ে যান। কিন্তু যাঁরা বাচ খেলতে পারছেন, যাঁরা কারণ জগতে গিয়ে আবার স্থূল জগতে ফেরত চলে আসতে পারছেন, কারণ জগতের সমস্ত ক্ষমতা তাঁর মধ্যে এসে যায়। তার মানে, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, তাঁর যত ক্ষমতা আছে, সমস্ত ক্ষমতাগুলো তাঁরও এসে যাবে। ঠাকুরের এই সমস্ত ক্ষমতাগুলো ছিল। স্বামীজীরও কারণ জগতের সমস্ত ক্ষমতাগুলো ছিল। চাইলেই তিনি নিজের চারটে শরীর দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন, কারণ তাঁর মধ্যে সৃষ্টির ক্ষমতা এসে গেছে। মেরি লুইবার্কের বইতে একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে যে, তিনি এই

রকম নিজের একটা শরীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই যে বাচ খেলা—এই তিনি সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করছেন, এই তিনি কারণ জগতে বিচরণ করছেন আর এই মহাকারণ, যেখানে মন পুরোপুরি লয় হয়ে যাচ্ছে, তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। নির্বিকল্প সমাধিতে গেলে যে জ্ঞান, নির্বিকল্প সমাধিতে গেলে যে শক্তি আসে, সবটাই ঠাকুরের আছে।

আগামীকাল কোন বাবাজী যদি বলেন তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে, আমরা কি করে বুঝব যে, তিনি সত্যি না মিথ্যা বলছেন? শক্তির প্রকাশ দেখে বুঝব। আমরা স্বসংবেদ্য বলি বটে, স্বসংবেদ্য মানে যিনি জানেন তিনিই জানেন। ঠিকই, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু শক্তিতে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে কি হয়নি। তিনি হয়ত আপনাকে আমাকে দেখাবেন না। কিন্তু যিনি ঠিক লোক, ওনার যাঁরা কাছের লোক, তাঁদেরকে ঠিক দেখিয়ে দেবেন। চারজন লোক অন্তত জানবে যে, তাঁর শক্তি আছে। ফলে কি হয়, তাঁর নরলীলা যখন শেষ হয়ে যায়, তারপরেও ওটা চলতে থাকে।

কারণ জগতে অনেকেই যেতে পারেন, ঈশ্বরদর্শন অনেকেই করতে পারেন, কিন্তু বাচ খেলা সবার পক্ষে সম্ভব না। এখানেও আছেন, ওখানেও আছেন, এ-জিনিস সবার হয় না। ঠাকুরের যত দর্শন, তাতে এটাই প্রতীত হয় যে, তিনি ধ্যান ধারণা করে এই লোকগুলিকে জয় করে নিয়েছেন। উপনিষদে বলছেন, ঔঙ্কারের ‘অ’ ‘উ’ ‘ম’ এর সাধনা যিনি করেন তিনি জ্বলকে জয় করেন, সূক্ষ্মকে জয় করেন, কারণকে জয় করেন। তার সাথে তিনি তাঁর সত্তা, তাঁর ক্ষমতা পেয়ে যান। শহরের যিনি বড়লোক, তাঁর যা টাকা-পয়সা ক্ষমতা আছে তাতে তিনি নিজের বাড়িতেও থাকতে পারেন, আবার সাধারণ কুঁড়ে ঘরেও থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর ঐশ্বর্যটা থাকবে। কিন্তু যে সাধারণ লোক, সে বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতেও পারবে না, থাকার তো প্রশ্নই নেই। আপনাকে নিমন্ত্রণ করলে, কিছুক্ষণের জন্য সেখানে থাকতে পারবেন, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য থাকতেই দেবেন না। এই হল তফাৎ, আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলির সঙ্গে দিব্যদর্শনগুলির এটাই সম্পর্ক।

ধ্যান আদি করার সময় আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার শক্তি বাড়ছে কিনা। সিদ্ধাইএর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ধ্যান ঠিক ভাবে করলে শক্তি নিজে থেকেই আসবে, আর ওই শক্তিতে আটকে থাকলে আপনি আর কোন দিন এগোতে পারবেন না। কিন্তু শক্তি থাকবেই, মনে যা ইচ্ছা জাগবে, সেটা পূর্ণ হবেই; যাকে যা বলবেন সেটা হতে বাধ্য। স্বভাব শান্ত হয়ে যায়, মনে যে খিটখিটানি থাকে, অনেক কমে যাবে, জাগতিক চাহিদাগুলি কমে যাবে; এগুলোতে বোঝা যায়; বোঝা যায় যে মানুষ অন্তর্লীন হচ্ছে। সবচেয়ে যেটা বোঝা যায়, সেটা হল শক্তি। ঠাকুরও পরে বলবেন, সবাই তাকে গণে মানে, ঈশ্বরকে যেমন সবাই মানে। ঠিক তেমনি, যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁকেও সবাই মানে। মাস্টারমশাইর দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বলছেন, এমনকি নিজের স্ত্রী পর্যন্ত। নিজের স্ত্রী মানবে না, কিন্তু ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেলে নিজের স্ত্রীও মানবে।

হলধারী বলত তিনি ভাব-অভাবের অতীত। এখানে ‘ভাব-অভাব’, এই পয়েন্টকে বোঝার দরকার। ভাব মানে হওয়া, অভাব মানে যে জিনিসটা নেই। বেদের নাসদীয় সূক্তে বলছেন, *নাসদাসীম্নো সদাসীৎ*, সৎ মানে যে জিনিসগুলিকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা হয়, অসৎ মানে যে জিনিসগুলিকে জানার উপায় নেই, তার মানে সেই জিনিসটা নেই। বেদে ঈশ্বরের নামে বলা হয়, তিনি ভাব-অভাবের পারে। হলধারী জপধ্যান করতেন, শাস্ত্র পড়তেন। পরে আবার হাজার কথার আসবে।

হলধারী, হৃদয় আর হাজার, ইংরাজীতে সবার প্রথম অক্ষর ‘এইচ’ (H), এনারা হলেন ‘শ্রী এইচ’। তিনজনই ব্রাহ্মণ, তিনজনই ঠাকুরের নিকট আত্মীয়। হলধারী জ্ঞানপথের, হাজার ভক্তিপথের, হৃদয় কর্ম করতেন, ঠাকুরের সেবা করতেন। তিনজনের কারুরই আধ্যাত্মিক পথে সে-রকম কোন উন্নতি হল না। অথচ অব্রাহ্মণ নরেন এলেন, রাখাল এলেন আর এলেন লাটু। সারা জীবন লাটু সেবাই করে গেলেন। রাজা মহারাজ ভক্তিপথের, স্বামীজী জ্ঞানপথের প্রতীক; আর কারুরই সাথে ঠাকুরের কোন



আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। অথচ আধ্যাত্মিকতায় তিনজনই কোথায় চলে গেলেন। জ্ঞান বলুন, ভক্তি বলুন, কর্ম বলুন, কোনটাই আপনাকে কোথাও নিয়ে যাবে না; সব কিছুর চাইতে দরকার ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা।

আমাদের একজন মহারাজকে তাঁর পূর্বাশ্রমের এক বন্ধু বললেন, ‘তোমার এত বছরের সন্ন্যাস জীবন, এতদিনে তোমার কি হল’? মহারাজ খুব সুন্দর বললেন, ‘তুমি তোমার সন্তানকে যেভাবে ভালবাস, এতদিনে ঠাকুরকে আমি সেভাবেই ভালবাসতে পারি’। মহারাজের বলার মধ্যে কোন ইমোশান নেই। আমি আপনি যখন বলি, তখন বলার মধ্যে ইমোশান লেগে থাকে—আহা মায়ের কি কৃপা, এই শব্দটা বলেছেন মানেই আপনি একজন দুঃস্বরী। কেন বলতে যাবেন? তার মানেই আপনার শক্তি নেই, আপনার হজম করার শক্তি নেই। আপনার যদি ভক্তি হয়, আপনার সেই শক্তিটাও আসবে, যেখানে আপনি সেটাকে হজম করে নিতে পারছেন। ঠিক ঠিক আপনার মধ্যে যদি প্রেমের ভাব জাগে, শুধু ঠাকুরের প্রতি না, নিজের সন্তানকেও যদি ওই ভাবে ভালবাসেন, নিজের স্বামীকে যদি ওই ভাবে ভালবাসেন, নিজের স্ত্রীকে যদি ওই ভাবে ভালবাসেন, কোন ছেলে যদি কোন মেয়েকে ওই ভাবে ভালবাসে, বা মেয়ে যদি ছেলেকে ওই ভাবে ভালবাসে, মন আর উত্তাল হবে না, মন শান্ত হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু মজা করে লিখলেন, ‘যা বুঝলাম, কেউ যদি ঠিক ঠিক প্রেম করে, সে অনাহত ধ্বনি শুনতে পারবে’। মজা করেই বলুন, এটা একেবারে সত্য। যদি ঠিক ভালবাসা হয়, যার প্রতিই হোক, ঈশ্বরের প্রতিই হোক কিংবা কোন মানুষের প্রতি হোক, যে ভালবাসায় কোন স্বার্থ নেই, কোন কামগন্ধ নেই, কোন কামনা নেই; এই ভালবাসা এলে, আপনার ভিতরে যে ওঁম্ ধ্বনি সব সময় চলছে, সেটা স্পষ্ট শুনতে পাবেন। যম, নিয়ম, আসন ইত্যাদি করে যে যোগশক্তি আসে, শুধু ভালবাসাতেই এই সিদ্ধিগুলি এসে যাবে।

হলধারী, হাজরা, হৃদয়রাম তিনজনই অসফল। কিন্তু ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা, শুধু ঠাকুরকে ভালবাসেন, তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা মনের গঠন আছে, ঠাকুরকে শুধু ভালবাসেন বলে, সেই মনের গঠনে পুরো শক্তিটা নেমে গেল। মিষ্টির দোকানে ময়রা ছানার খুব সুন্দর সুন্দর মিষ্টি বানিয়ে রেখেছে। সাদা রঙের রসগোল্লা, লাল রঙের পানতুয়া আর কালো রঙের ছানাবড়া, সব কটাকেই ময়রা রসে দিয়ে দেয়, আর সে রস টেনে নেয়, তারপর যে যা হওয়ার হয়ে যায়। ভিতরে ছানার ওই মিষ্টিটা যেন তৈরী থাকে। ঠাকুর বললেন, সবাই কলাই ডালের খদ্দের। কলাই ডালকে রসে ফেলে দিন কিছু হবে না। সেই ডালকে ভাল করে বেটে জিলিপি করে ভেজে তাকে রসের মধ্যে ছেড়ে দিল, এবার সে পুরো রসকে টেনে জিলিপি হয়ে আমাদের জিভ থেকে জল বারাবে। জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ, কর্মপথ কোন পথই কাজ করে না যতক্ষণ টপ টপ করে রস না পড়ছে। রসে যখন ডুবে গেল তখন তাদের কেউ হবে জিলিপি, কেউ হবে ছানাবড়া, কেউ রসগোল্লা, কেউ পানতুয়া; ভগবানের নামই রসবে সঃ। তখন লাটু স্বামী অদ্ভুতানন্দ হয়ে যান, রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ হয়ে যান, নরেন তখন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে যান। আর তা যদি না হয়, এই জগতে ঘুরঘুর করতে থাকবে, তুই যে কলু, সেই কলু। এটাকেই ঠাকুর সাধুর কমণ্ডলুর সাথে তুলনা করছেন। আগেকার দিনে চালকুমড়োর শাঁসটাকে ফেলে দিয়ে কেটে কমণ্ডলু তৈরী হত। ওই কমণ্ডলু সাধুর সঙ্গে সমস্ত তীর্থ ঘুরে আসে, কিন্তু যে তেতো সেই তেতোই থাকে।

এই হলধারী ঠাকুরকে বললেন তিনি ভাব-অভাবের পারে। সেই কথা শুনে ঠাকুর বললেন, আমি মাকে গিয়ে বললাম, মা, হলধারী এ-কথা বলছে, তাহলে রূপ-টুপ কি সব মিথ্যা? মা রতির মার বেশে আমার কাছে এসে বললে, ‘তুই ভাবেই থাক’। আমিও হলধারীকে তাই বললাম। রতির মা একজন কর্তভজা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসা-যাওয়া করতেন। প্রচণ্ড গোঁড়া ছিলেন, কিন্তু একজন ভক্তিমতি মহিলা। পরে ঠাকুরকে মা-কালীর প্রসাদ খাচ্ছেন দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে আসা বন্ধ করে দিলেন। ঠাকুর মা কালীকে গতকাল দেখলেন গেরুয়া জামা পরা, আর-একদিন দেখলেন মুসলমানের মেয়েররূপে, মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী, ঠিক তেমনি এবার রতির মায়ের বেশে এসে ঠাকুরকে এই কথা বললেন—‘তুই ভাবেই থাক’।

ভাবে থাকার অর্থ, এই যে অখণ্ড আর আপেক্ষিক অর্থাৎ যেখানে আমাদের জগৎটা আছে, এই দুটোর মাঝখানে থাকা। আমাদের মত লোকেরা আমরা এই জগতেই সর্বদা বাস করি, যেটা আপেক্ষিক। সমাধিবান পুরুষ যিনি তিনি অখণ্ডে বাস করেন। দুটোর মাঝখানে যে এই বিভাজন রেখা, যেখানে এক পা অখণ্ডে, আর-এক পা দ্বৈতরূপী জগতে, এ-জিনিস সাধারণ ভাবে হয় না, এটাকেই বলছেন—ভাবে থাকা। এই অবস্থা অবতার পুরুষ না হলে হবে না। সন্ত-মহাত্মা যাঁরা তাঁদেরও হয় না। সন্ত-মহাত্মা কারা? যাঁরা ওই সূক্ষ্ম জগতে ঠাকুরের রূপ দর্শন করেছেন আর খুব হলে কারণ জগতে ঈশ্বরের রূপ দর্শন করেছেন। ঠাকুরের অনেকগুলো রূপ—স্কুল জগতে যখন আসেন তখন অবতার রূপে আসেন, ঠাকুর সূক্ষ্ম জগতে থাকেন, তখন একটু কষ্ট করে ধ্যান করলে সেই রূপের দর্শন হয়, এই দর্শনে মুক্তি কিন্তু হবে না। কারণ জগতে ধ্যান করে করে যখন ওই অবস্থায় চলে গেলেন, সেখানে যিনি স্রষ্টা, ঠাকুরকে ওই রূপে দেখেছেন, তখন রামকৃষ্ণলোক, বৈকুণ্ঠলোক যেটা বলা হচ্ছে, ওই রূপে দর্শন হয়। আর শেষে মহাকারণ, এই কারণকেও যখন পেরিয়ে গেল, সাধারণ ভাবে লোকেরা এটা পারেন না। আমরা মনে করি তিনি উচ্চমার্গের সাধু, কিন্তু ‘ভাবে থাকা’ এ হয় না। এনারাই হলেন ঠিক ঠিক জ্ঞানী, এনারের আর জন্ম নিতে হয় না। ঠাকুরের সূক্ষ্মরূপ যাঁরা দর্শন করেন, তাঁদের আবার জন্ম হয়। ঠাকুরের কারণ রূপ যিনি দর্শন করেছেন, ঠাকুর ইচ্ছে করলে তাঁকে এদিকে পাঠাতে পারেন, আবার অন্য দিকেও পাঠাতে পারেন। কিন্তু যিনি মহাকারণে চলে গেছেন, তাঁর আর জন্ম হবে না। সেই মা রতির মার বেশে এসে ঠাকুরকে বলছেন, তুই ভাবেই থাক।

**এক-একবার ও-কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙে গেল। তাই দৈববাণী বা প্রত্যক্ষ না হলে ভাবেই থাকব—ভক্তি নিয়ে থাকব। কি বল? ভগবানকে দেখে একবার তিনি এক জ্ঞান করে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিলেন, সেই সময় পড়ে গিয়ে তাঁর দাঁত ভেঙে গিয়েছিল।**

**প্রাণকৃষ্ণ—আজ্ঞা।** কি আশ্চর্য, এত উচ্চকথা বলছেন, বলে আবার বলছেন, দৈববাণী যদি না হয় বা প্রত্যক্ষ যদি না করি, তাহলে ভাবেই থাকব, তার মানে ভাবটাকে মানব। যে ঈশ্বরীয় রূপ যেটা আছে, সেটাকে ভাবে মানব। ঠাকুর সবটাকেই ছিলেন—কখন সচ্চিদানন্দই আছেন, এই ভাবেও থাকতেন; কখন এই জগৎ আছে, ঈশ্বর আছেন, এখানে তিনি নানান রূপে দর্শন দিচ্ছেন, এই ভাব নিয়েও থাকতেন। এখানে ভাব বলতে এটাই, যেখানে ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে এসে দর্শন দিচ্ছেন। ঠাকুর পর পর তিনটে বর্ণনা দিচ্ছেন, কখন রতির মার বেশে, গেরুয়া জামা পরে আর মুসলমান বেশে/ এ-ছাড়া আরও কত কি দর্শন ঠাকুরের হত। ভগবানের ঠিক ঠিক বর্ণনা হল, তিনি বহুরূপী। ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন, ফচকিমি করছেন, তিনিই আবার কখন কৃষ্ণ রূপে আসছেন, কখন গৌরাজ রূপে আসছেন—ভাবলে কেমন অবাক লাগে।

একবার কয়েকজন মহারাজদের সাথে আলোচনা চলছিল। সেখানে এক মহারাজ প্রশ্ন করলেন, অন্যান্য গুরু যাঁরা আছেন, বা ইদানিং বাবাজী যাঁরা আছেন, এনারের সঙ্গে ঠাকুরের কি তফাৎ? আমি তাঁকে মজা করে বললাম, মজা করে বললেও বক্তব্যটা ঠিকই ছিল। ‘একটা পানের দোকান আর একটা শপিং মল, দুটোতে তফাৎ কি জানেন?’ প্রথমে উনি বুঝতে পারলেন না কি বলতে চাইছি। আমি বললাম, ‘পানের দোকান সেটাও একটা বিজনেস সেন্টার, সেখানেও টাকার আদান-প্রদান হয়; শপিং মল, সেখানেও টাকার আদান-প্রদান হয়। তফাৎ হল পানের দোকানে শুধু পান পাওয়া যায়, হদ্দ একটু সুপরি বা পানের মশলা পাওয়া যাবে। বড় শহরের শপিং মলে সব কিছু পাওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম জগতের শপিং মলের মত, কত কি আছে, ইতি করা যায় না। ঠাকুর ঈশ্বরকে নিয়ে বলছেন, ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বরের ভাবও অনন্ত। ঠাকুর অনন্ত তাই অনন্ত তাঁর ভাব। এই এক পাতার মধ্যে এত কিছু আছে যে, প্রত্যেকটি লাইনে আমাদের খামতে হচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, কথামৃত যদি খুব ভাল করে পড়া হয় আর তার সঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গ যদি দেখে নেওয়া হয়, ধর্মজগতে জানার কিছু আর বাকি থাকবে না।

এখন পর্যন্ত ধর্মজগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, কথামূতে আর কিছু বাকি থাকে না। পরে পরে আরও আচার্যরা আসবেন তাঁরা আবার নূতন কিছু বলবেন। ঠাকুরও নিজেই নিয়ে বলছেন, এখানে হেউটেউ ব্যাপার। আবার বলছেন, সমস্ত চেক এখন থেকে পাস করাতে হয়। কোন আধ্যাত্মিক কথা, কোন আধ্যাত্মিক বিষয়, কোন আধ্যাত্মিক মত ঠিক কিনা, ঠাকুর যদি ঠিক বলে দেন, ওটাকে আর কেউ নাকচ করতে পারবেন না। এই যে আমরা প্রণাম মন্ত্রে বলি, অবতার বরিষ্ঠায়, এইজন্যই তিনি অবতার বরিষ্ঠ।

অন্যান্য যে সম্প্রদায়, অন্যান্য যে ধর্ম, অন্যান্য যে ধর্মগুরু, অন্যান্য যে অবতার; তাঁরা সবাই মহৎ কোন সন্দেহ নেই। ছোটবেলা বাজারে কাপড় কিনতে একটা দোকান, মিষ্টি কিনতে আরেকটা দোকান, চাল কিনতে অন্য দোকানে যেতে হত; এখন একটা শপিং মলে ঢুকে যান, সব কিছু একই ছাদের তলায় পেয়ে যাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে সবটাই পাওয়া যায়, শুধু দেখার দৃষ্টিটুকু চাই। সেটাতেও বিশেষ দৃষ্টি লাগে না, একটু যদি পড়াশোনা থাকে, সত্যিই যদি একটু মন ধর্মের দিকে থাকে, জপধ্যান অল্প একটু যদি করে থাকেন, সকাল-বিকাল একশ আটবারও যদি কিছু দিন করে থাকেন, ঠাকুরের কথাগুলো একটু একটু বুঝতে পারবেন, তিনি কি বলতে চাইছেন। অন্য আর কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, এটা বুঝতে পারবেন—এ এক বিশাল ভাণ্ডার। যদি এটুকুও বুঝে নেওয়া যায়—এটা বিশাল এক ভাণ্ডার, বুঝে নিন আপনার উপর ঠাকুরের অশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়েছে।

কারণ, প্রথমটা হল, বড়দের মুখে অনেকেই শুনেছেন ঠাকুর অবতার, ঠাকুর যে অবতার এর উপর অনেক লেখালেখিও হয়, এগুলো পড়েছেন বা শুনেছেন, এটা একটা জিনিস। এর থেকেও বেশি যেটা, কিছু সাধু সন্ন্যাসীদের দেখেছেন, কিছু ভাল সাধুর সঙ্গ করেছেন, সেখান থেকে আপনার মনে একটা ছাপ পড়েছে। সেই ছাপ পড়ার পর আপনি আরও অনেক জায়গায় ক্লাশ শুনে গেছেন, দীক্ষা নিয়েছেন। এগুলো হল সব শোনা কথা, চারজনের কাছ থেকে শুনে শুনে এ-রকম করেছেন। কিন্তু মন যখন একটু শুদ্ধ হবে, মন একটু যখন স্বার্থবিহীন হবে, নিজের দেহমন, ইন্দ্রিয় থেকে সরে যাবে, পুরো তো সরবে না, অল্প একটু। অতটুকু যদি ঠাকুরের কথা ঢুকতে পারে, কথামূতে ঠাকুরের কথাগুলো তখন ভিতর থেকে বোধ হবে—মা গো! কি সাংঘাতিক। যদি এতটুকু আপনার কোন দিন বোধ হয়, বুঝবেন ঠাকুরের অশেষ কৃপা। অন্যরা কেউ পুকুর, কেউ ডোবা, কেউ দীঘি, ঠাকুর হলেন মহাসমুদ্র।

এই কথাগুলো আমি কোন ইমোশানালি বলছি না। জীবনে ইমোশানের কোন স্থান নেই। স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক সেখানেও ইমোশানের কোন স্থান নেই। রাসলীলাতে দেখুন, গোপীদের সাথে তিনি রাসলীলা করছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ইমোশানের কোন স্থান নেই। ভক্তিতে যে ভক্তি করা হয়, সেটা ভালবাসা, কখনই সেটা ইমোশান না, ভক্তি মানে অত্যন্ত উচ্চমানের জ্ঞান। জ্ঞানে নিজেই জানে, ভক্তিতে যে ভালবাসা সেই ভালবাসাতে যিনি পর তাঁকেও আপন বলে বোধ হয়। সাধারণ স্তরে জ্ঞানের পরিসীমা কতটা বেড়ে গেছে ভেবে দেখুন। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা অত্যন্ত স্বার্থপর হয়। অনেকদিন আগে আমার এক সন্ন্যাসী বন্ধুর সাথে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেমন আছেন?’ বললাম ‘ভাল আছি’। দুটো একটা কথার পর বললাম, ‘দেখুন একটা বয়স হয়েছে আমার, একা একা নিজের জগতে থাকি। এই পরিস্থিতিতে পিকিউলারিটিজ, বিচিত্রতা, আজবতা এগুলো মানুষের একটু বেড়ে যায়, কিছু করার নেই; বেড়ে যায়, এগুলো আছে। আমার মনের মত না হলে একটুতেই রেগে যাই’। বাইরের লোকেরা এগুলো করবেন না, বাইরের লোকেরা সবাইকে নিয়ে চলে।

ঠাকুর বলছেন, মা আমায় শুটকো সাধু করিসনে। এই যে ঠাকুর ‘শুটকো’ বলছেন; শুটকো কারণ স্বভাবে যাঁরা জ্ঞানের পথে যান, তাঁরা আত্মকেন্দ্রিত হয়ে যান, সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে দিচ্ছেন কিনা। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা যখন হরিদ্বারে গিয়ে প্রথম সেবাকার্য শুরু করলেন, তখন ওখানকার সাধুরা বলছে ভাগি সাধু, অর্থ হল মেথর সাধু। নিজেরা একেবারে স্বার্থপর, নিজের থাকাটুকু, খাওয়াটুকু হয়ে গেলেই হল, তার বাইরে ওরা অন্যদের কিছু দেখবে না। ভক্তি পুরো অন্য রকম, ভক্তি ভালবাসা

থেকে হয়। জাগতিক স্তরে ভক্তিকে আমরা বলি প্রেম। মা আর ছেলে আলাদা সত্তা, ছেলে পর, কিন্তু তাকে মা আপন করে নিচ্ছে; বাবা ছেলেকে আপন করে নিচ্ছে। স্বামী আর স্ত্রী দুটো পুরো আলাদা সত্তা, আলাদা ব্যক্তিত্ব কিন্তু ভালবাসা যখন আসে, বিয়ে না, তখন দুজন এক হয়ে যায়। তখন দেখবেন তাদের খাওয়া, চলাফেরা এক হয়ে যায়। কথা বলার ধরণটাও এক হয়ে যায়। ভক্তি, ভালবাসা, প্রেম এ হল উচ্চমানের জ্ঞান। এখানে স্বার্থের ভালবাসা, প্রেমের কথা বলা হচ্ছে না। গোপীরা বিদ্রুপ করে বলছেন, ভ্রমর যখন ফুলের মধু পান করে নেয়, তখন সে ওই ফুলকে ছেড়ে উড়ে চলে যায়। এখানে সেটার কথা বলা হচ্ছে না। বাস্তবিক যেখানে ভালবাসা, তার কথা বলা হচ্ছে।

ঠাকুরের এই যে কথামৃত, কত কি আছে। যেটা বললাম এখানে আমার কোন ইমোশান নেই। পুরো অধ্যয়ন না করে থাকলেও, টুকটাক উল্টেপাল্টে তো দেখেছি, এক এক পাতায় কত কি জিনিস, এক কথায় —ভ্যারাইটিজ। একই জিনিস পাঁচ ভাবে বলছেন, তা না, ভ্যারাইটিজ। যেদিন আপনার মনে হবে, আমাদের ক্লাশ শুনেও যদি মনে হয়, কত কি জিনিস, বুঝবেন আপনার উপর ঠাকুরের কৃপা হয়েছে। অনেক আগে কথামৃত নিয়ে আমি কাজ করছিলাম। আমার এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিলাম, দেখুন তো কেমন। তিনি ঠিক ভক্ত নন, কিন্তু অনেক কিছু জানেন। উনি পড়ে বললেন, ‘বাঃ খুব ভাল, লোকেরা পড়ে মনে করবে, শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত বইটা একটা গভীর বই’। আমার ওই কথাটা ভাল লাগেনি, আমি ভেবেছিলাম আরও কিছু বলবেন। কিন্তু যাই হোক, এই জিনিসটা হয় —কি সাংঘাতিক ভ্যারাইটি। বাইবেল পড়লে মনে হবে কি সাংঘাতিক ভ্যারাইটি, মনে হবে যেন বেদান্ত পড়ছি। কথামৃতে পড়লে দেখবেন সব কথা ওর মধ্যে ঢুকে আছে, আরও অনেক কিছু আছে, তারপরেও আরও অনেক কিছু আছে। এ যেন ইতি করা যায় না। স্বামীজী যখন হাজার, পনেরশ বছরের কথা বলছেন, এর অর্থ এটাই যে, একে পুরোপুরি করার জন্য এত সময় লাগবে। আর দ্বিতীয় কোন অবতার যদি এসে যান, তাতে কোন লাভ হবে না। কারণ এখন যে যুগ, এই যুগের যতটুকু দরকার তার সবটাই কথামৃতে রাখা আছে। এই কথাগুলো বলে আমরা কথামৃতে প্রবেশ করছি।

এর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণকে বর্ণনা করছেন, কিভাবে রতির মার বেশে এসে মা ঠাকুরকে বলছেন, তুই ভাবেই থাক। ঠাকুর তখন বলছেন, তাই দৈববাণী বা প্রত্যক্ষ না হলে ভাবেই থাকব — ভক্তি নিয়ে থাকব। ‘কি বল’? প্রাণকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন। প্রাণকৃষ্ণকে ঠাকুর ভালবাসতেন, আদর করে মোটা বামুন বলতেন। ঠাকুরের কাছে আসা-যাওয়া করতেন, বেদান্তী ছিলেন। তিনি আর কি বলবেন, বলছেন —‘আজ্ঞা’। এখান থেকে ঠাকুর এবার পুরো অন্য দিকে চলে যাচ্ছেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ** —আর তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা করি। এর ভিতরে কে একটা আছে। সেই আমাকে নিয়ে এইরূপ কচ্ছে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হত, —আমি পূজা না করলে শান্ত হতুম না।

‘এর ভিতরে কে একটা আছে’ এটাই হল মূল বাক্য। আমরা স্বাভাবিক ভাবে জানি আমরা হলাম প্রানী, প্রানী মানে চিঞ্জড়গ্রন্থি। শরীরটা জড়, এর ভিতরে চৈতন্য কিছু একটা আছে, যেটা মৃত্যুর সময় এই জড় শরীরটা ছেড়ে চলে যায়। মৃত্যু যে কোন কারণে হতে পারে, স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে, অঘটনে হতে পারে, আত্মহত্যাও করে নিতে পারে। কিছু এমন একটা হয়, যদি হার্ট বা ব্রেন বন্ধ হয়ে যায়, ভিতরে যিনি জীবাত্মা আছেন, তিনি ছেড়ে চলে যান। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে এই জিনিসটা খুব সুন্দর বর্ণনা করেন, শিশু যখন গর্ভস্থ হয় সাধারণত বলা হয় যে ছ-মাস হলে জীবাত্মা যিনি তিনি গর্ভস্থ শরীরে প্রবেশ করেন। এই যে প্রবেশ করেন বলা হচ্ছে, উনি কি নিজের ইচ্ছায় প্রবেশ করেন, নাকি তাঁর কর্ম, জ্ঞান তাঁকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, জীবাত্মা এখানে যেন অসহায়। আসলে আমরা সবটাকেই অসহায়, আমরা মনে করি আমি মুক্ত কিন্তু সব কিছুতে অসহায়। আপনি যে হাঁটাচলা করবেন সেখানেও অসহায়, ওখানে আপনার একটা বাঁধা গতি আছে, ওর বেশি বেগে চলতে পারবেন না। খুব হলে দৌড়াবেন, তাও কত আর গতি বাড়তে সক্ষম হবেন, খুব বেশি

না। খাওয়া-দাওয়াতে দেখুন, আপনি কতটুকু আর খেতে পারবেন। সব কিছুতে আমরা বাঁধা। কিন্তু ঠাকুর এমন একটা বোধ দিয়ে দিয়েছেন, সেখানে সব কিছুতে মনে হয় আমরা মুক্ত। অবশ্যই মুক্ত, মুক্ত হলেন ভিতরে যিনি আছেন, তিনি সদামুক্ত। আত্মা রূপে আমি মুক্ত, দেহ রূপে আমি মুক্ত না। জীবাত্মা কত কোটি আছে আমাদের কাছে হিসাব নেই। এই যে এত মশা-মাছি মরছে; কত পশুপাখি মরছে, মানুষ মরছে, আগে আগে কত প্রাণী মরে আছে। সমস্ত জীবাত্মা, মৌমাছি যেমন চাকের কাছে অনবরত গুণ্গুন্ করছে, সব জীবাত্মা অসংখ্য মৌমাছির মত গুণ্গুন্ করছে, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না, তারাও আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। যেমনি একটি গর্ভ তৈরী হয়ে গেল, ওর মধ্যে গিয়ে জীবাত্মা প্রবেশ করে গেল। জীবাত্মা যেমনি প্রবেশ করে গেল, ওটা ওখানে তালাবন্ধ হয়ে গেল। কোন কারণে জীবাত্মা যদি বুঝে যায়, এই গর্ভটা তার জন্য একটা ভুল গর্ভ, তার কর্ম তাকে ঠেলে বার করে দেবে। এটা বাস্তবিক, আমি কোন থিয়োরি দিচ্ছি না। সাধারণ ভাবে এই গর্ভগুলো সফল হয় না। এটা বলে যে, প্রথমে দিকে এই ধরনের গর্ভ টিকতে পারে না। অনেকেরই দেখবেন গর্ভপাত হয়ে যায়। আসলে কোন কারণে জীবাত্মা যিনি গর্ভে গেলেন, ওখানে তিনি যদি দেখেন মনের মত কিছু পাচ্ছেন না, তখনই গর্ভটা নষ্ট হয়ে যায়। মনের মত যদি হয়ে যায়, তবেই তিনি ওখানে বাস করবেন।

কখন কখন এমন হয় যে, দুটো জীবাত্মা, একই রকমের স্বভাব, প্রবৃত্তি; দুটো জীবাত্মার একই রকম tendency হতেই পারে। দুজনে এক সঙ্গে গর্ভে প্রবেশ করে গেল, সেখান থেকে যমজ সন্তানরা জন্ম নেয়। ওদের ব্যবহার, চালচলন সব একই রকম হয়। এগুলো এনারা এভাবেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এই জিনিসগুলো নিয়ে শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা এর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই, সেইজন্য আমরা বলতে পারিনা যে এটা ভুল। ক্লোনিংএর ক্ষেত্রে অনেকটা এই রকমই হয়। আবার অন্য রকমও আছে, যোগীদের মধ্যে যাঁরা উন্নত, তাঁরা চাইলে একই মন নিয়ে, একই জীবাত্মা নিয়ে অনেকগুলো শরীর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, যার দৃষ্টান্ত আমরা ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রীর কাহিনীতে পাই। কিন্তু সেখানে ভগবান, ভগবান যে কোন জিনিস করতে পারেন। কিন্তু চাইলে যোগীরাও পারেন। রাজযোগে বলছেন, কায়ব্যুহকায়, অনেকগুলো শরীর দাঁড় করিয়ে নেন।

একটা অন্য থিয়োরিও আছে, যদিও খুব প্রচলিত নয়। সেখানে বলেন যে, একটা শরীর যখন তৈরী হয়, মা-বাবা একটা genetic built যখন দিলেন, গর্ভস্থ শরীরটা যখন ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন যে সে একটা জীবাত্মাকে যেন capture করে নেয়। যদিও এই থিয়োরিটা খুব একটা প্রচলিত নয়, তবে থিয়োরি শুনে রাখা ভাল, এতে কোন দোষ নেই। রেডিও ওয়েভ যেমন ছাড়ে, আমার আশপাশ দিয়ে কত রেডিওর ওয়েভ অনবরত আসছে যাচ্ছে, আমরা ধরতে পারছি না। কিন্তু কারুর রেডিও ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করা থাকলে সেই রেডিও ওয়েভকে ধরে নেবে। ঠিক সেইভাবে শরীর জীবাত্মাকে টেনে নেয়।

এখন শরীরে জীবাত্মা প্রবেশ করুন, শরীর জীবাত্মাকে টেনে আনুক, যেটাই হোক, সত্তা দুটি হয়ে যায়—দেহ আর আত্মা। এই যে আমি, আপনি, আমাদের ভিতরে যে জীব, এই জীব অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত। সে ভোগ করতে চায়, অজ্ঞান মানেই সংসারকে ভোগ করার ইচ্ছা। যাদের ভোগ শেষ হয়ে যায়, তারা সংসারে আর থাকতে চান না। অবতার পুরুষ বা অবতারের সঙ্গী যাঁরা তাঁদের বাদে বা কখন ঈশ্বর যদি কাউকে আদেশ করেন, কোন সাধু, কোন সিদ্ধপুরুষ এই সংসারে থাকতে চান না। তার কারণ সংসার আমার লাগবে না, সংসার থেকে যা কিছু নেওয়ার আছে আমার কোন কিছুই লাগবে না। আপনি শপিং মলে গেছেন, আপনার যা কেনাকাটা করার ছিল সব হয়ে গেছে, আপনি আর কেন মলে থাকতে চাইবেন, একটু ঘুরে ঘুরে দেখার ইচ্ছা থাকলে, একটু দেখে নিলেন, এবার বাড়ি চল। এনারাদের বাদে যত জীবাত্মা আছে সবাই ভোগ করতে চাইছে, কিন্তু আত্মা কখন ভোগ করতে পারে না, কারণ আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য। সেইজন্য সে কি করে, মনের একটা আবরণ নিয়ে নেয়। আপনি এখান থেকে

সমুদ্র পেরিয়ে যেতে পারবেন না। আমরা সেইজন্য একটা নৌকা বা জাহাজ তৈরী করে নিই যাতে সমুদ্রের পারে যেতে পারি। আত্মা সেইজন্য করেন কি, নিজের আর এই সংসারের সঙ্গে মিলে একটা মাঝামাঝারি জিনিস মন, এর সঙ্গে জুড়ে নেয়।

মন দুদিকেই তাল দেয়, সংসারের দিকেও তাল দেয়, আত্মার দিকেও তাল দেয়, কিন্তু মন জিনিসটা হল সংসারের। ফলে মন যত ভোগ করে তত সে পাল্টাতে থাকে। ধীরে ধীরে সেই যে জীব, তাঁর যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, সেটা হারিয়ে যায়। মহাভারতে নারদ ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, ‘তোমার যারা সেবক আছে, তাদেরকে বেশি লাই দিয়ে মাথায় তুলো না, তা যদি না কর তাহলে তোমার পিছনে, এমনকি তোমার সামনে এসে তোমাকে উপদেশ দেবে। তুমি কিছু করতে যাবে, বলবে, আপনার দ্বারা হবে না। যে সেবক সে সেব্য থেকে বেশি প্রাধান্য পেতে শুরু করে। মালিক থেকে তার ভূত্যের গুরুত্ব বেশি হয়ে যাবে’। আমি, আপনি, আমাদের সবারই ক্ষেত্রে এই একই জিনিস চলছে। মন আমাদের ভূত্য, কিন্তু সে আমাদের পেয়ে বসেছে, কথা শুনতে চায় না, উলটে আমাদেরই তার কথা মত চলতে বাধ্য করার চেষ্টা করে যাবে।

আপনি বললেন, কাল থেকে পাঁচটায় উঠব। আরেকটু উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলে বলবেন, ভোর চারটায় উঠব, আরও বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলে, মাথা যদি খারাপ থাকে, বলবেন ভোর তিনটেয় উঠব। মন বলবে, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই উঠবে। বিকারের রোগীর মত, যেমনি চারটে কি পাঁচটা বাজল, মন হল এই সংসারের জিনিস, সে দেহের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; বলবে, ধুৎ কাল থেকে দেখা যাবে, আজ থাক। চেতনা যখন জাগতে শুরু করে, একটু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যখন আসে, ভিতরে যিনি আছেন তিনি বলবেন, ‘এটা কি হল’? ‘বললাম তো কাল থেকে হবে’। ‘ঠিক আছে, আজ ছেড়ে দিলাম’। আগামীকাল ওই একই জিনিস হবে। কারণ বাস্তব আমি যেটা, আমি যে শুদ্ধ আত্মা, আমি এই চরাচর জগতের মালিক, আমি আমার সৃষ্টি করা আমার যে সেবক, সে আমারই কথা শুনছে না, শুধু শুনছে না, আমাকেই ডিকটেস্ট করছে। ইদানিং যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজকাল রোবট আদি তৈরী করার চেষ্টা করছে; সেখানে মেশিন লার্নিং দিয়ে তাকে ট্রেনিং দিচ্ছে, তাকে ইন্টেলিজেন্স দিচ্ছে, আর সে যেই ক্ষমতাবান হয়ে গেল, আর এতই ক্ষমতাবান হয়ে যাবে যে আমারই কথা শুনবে না, শোনা থাক, আমাকেই ডিকটেস্ট করছে। আর আমি যাতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে, frustrated হয়ে বেরিয়ে না যাই, সেইজন্য একটু শান্ত শান্ত রাখে।

একটা নামকরা টার্ম আছে –Toxic Relationship। এই রিলেশানশিপে কি হয়, দুজন আছে, স্বামী স্ত্রী হতে পারে, ছেলে-মেয়ে হতে পারে। থেকে থেকে আপনাকে বিষ ঢালবে। যেমনি আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে, আপনি ছেড়ে চলে যাবেন ভাবছেন, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি একটা কিছু করে আপনাকে আটকে দেবে। রাজযোগে পুরুষ-প্রকৃতির রিলেশানে এটাই বলা হয়, পুরুষ যখন বিরক্ত হতে শুরু করে, অনেক ছোবল খাওয়া হয়ে গেছে, প্রকৃতি সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টি কিছু দিয়ে দেবে। মুণ্ডকোপনিষদে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর করে দেখান হয়েছে –*দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*। পাখি যেমনি একটা কটু ফল খেল, চোঁচা করে উপরের ডালে উড়ে গিয়ে বসে পড়ে। সেখানে মিষ্ট ফলের আনন্দ পায়। সেখানেও যদি তিক্ত ফল পেত তাহলে সে আরও উপরে চলে যেত। ঠিক তেমনি প্রকৃতি আপনাকে বেরোতে দেবে না। Toxic Relationshipএ এটাই হয়। কিন্তু যাদের আত্মা জাগেনি, তারা মনের সঙ্গে এক হয়ে খুব এনজয় করতে থাকে। সমস্যা তখন হয় যখন ওই আত্মা অন্য দিকে যেতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে toxic segregation হয়ে যায়। আত্মা উপরের দিকে যেতে চাইছেন, মন তাঁকে যেতে দেবে না। মন এমন নাচাবে যে বেরোতেই দেবে না। এরপর অনেক চেষ্টা করে করে, নিজের ক্ষমতার জাহির করে করে আত্মা মনকে মনে করিয় দেয়, দেখ আমিই মালিক; এই করে করে মনকে যখন শুদ্ধ পবিত্র করে দেবে, তখন মন ধীরে ধীরে আবার নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন মনকে যেমনটি বলবে তেমনটি শুনবে। কারণ আত্মার আর ভোগের ইচ্ছা নেই কিনা। এইজন্য শাস্ত্র আমাদের বারংবার

বলেন, যতক্ষণ তোমার ভোগের ইচ্ছা আছে, যে কোন ভোগ, আপনি একজন ভাল লেখক হতে চাইছেন সেটাও ভোগ, যতক্ষণ ভোগের ইচ্ছা ততক্ষণ শুধু হরিনাম করে যেতে হয়। যতদিন ভোগের ইচ্ছা থাকবে, ততদিন জপধ্যান এগুলো হয় না। ঠাকুর কলকাতার লোকদের জানতেন, কলিকালে কলকাতার লোকগুলো কোথা থেকে জপ করবে, কোথা থেকে ধ্যান করবে, কোথা থেকে যোগ সাধন করবে, বলছেন তোমরা হরিনাম, শুধু হরিনাম করে যাও। মন যখন একটু পবিত্র হবে, অনেকটা যখন পবিত্র হবে, তখন জপধ্যান এসব হবে।

আমার যখন কম বয়স ছিল তখনই সন্ন্যাসী হয়ে গেছি, জপে বসলেই সব মনে পড়ত কার কার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, কাকে কাকে উত্তর দিতে হবে, কি কি উত্তর দিতে হবে, ভাল করে সব প্ল্যানিং হয়ে গেল। জপের আসন থেকে উঠে খুঁজতে লেগে গেলাম, উনি কোথায় আছেন। এখন বয়স হয়ে গেছে, ঠাকুরের কথায় দাঁত পড়ে গেছে, এখন তাই আর দুর্গাপূজা করি না। এই শুদ্ধ মন তখন এত শুদ্ধ হয়ে গেল যে, ওটা আত্মা নাকি মন, আর বোঝা যাবে না। স্বামীজী এর উদাহরণ দিচ্ছেন, প্রদীপ কাঁচ দিয়ে ঢাকা, কাঁচ এত পরিষ্কার যে কাঁচ আছে কি নেই বোঝাও যায় না। তখন মন আত্মা বলে বোধ হয়, আত্মা মন বলে বোধ হয়; দুটোর মধ্যে আর কোন তফাৎ নেই। আত্মা যা বলবে, মন তাই করবে। শুদ্ধ মনে যেটা উঠবে, আসলে তা আত্মারই কথা। যাঁরা এই কথাগুলো প্রথম শুনছেন বা বেশি শোনেননি, তাঁর এই জায়গাটা বুঝতে পারবেন না, বুঝতে একটু সময় লাগবে।

আত্মা আর মন এত শুদ্ধ হয়ে যায় যে, শেষে বাধ্য হয়ে দেহটাও শুদ্ধ হয়ে যায়। ওই দেহ দিয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ কোনটাই হয় না। ঠাকুর যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক করতে চাইতেন, তিনি পারতেনই না, অসম্ভব ব্যাপার। কারণ মন শুদ্ধ হয়ে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেছে, ফলে দেহটাও শুদ্ধ হয়ে গেছে, চেষ্টা করলেও পারবেন না। এটাকেই ঠাকুর বলছেন, তার বেতলায় পা পড়ে না। তিনি যদি ফেলতেও চান, পা পড়বে না। কারণ আত্মার যে স্বভাব, সেই স্বভাবে মন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মন ওই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় বলে, দেহটাও পাল্টে যায়। রাজযোগে স্বামীজী পরিষ্কার বলছেন, যদি কারুর স্বভাব জোর করে পাল্টানোর চেষ্টা করা হয়, তার একটা বাজে বিরূপ প্রভাব পড়ে, মাথাটাই খারাপ হয়ে যায়; সেইজন্য জোর করে কোন কিছু করতে নেই; ধীরে ধীরে, শান্তভাবে চলতে হবে, কিন্তু এই চলাতে একটুও ছাড় দেওয়া যাবে না, continuous process। ফলে এই ধরনের শুদ্ধ পবিত্র মন কদাচিৎ যদি আমিতে যায়, তখন দেখে, আরে আমি তো কখনই স্বাধীন ছিলাম না। এর ভিতরে যিনি আছেন, যিনি চৈতন্য, যিনি জ্ঞানবান, যিনি শক্তিমান, তিনিই সব করেন।

কিন্তু আত্মা কিছু করেন না, তিনি মনকে দিয়ে করান, শরীরকে দিয়ে করান। একটা স্পর্শ করলাম, বললাম বাঃ খুব সুন্দর, বস্তুটা খুব সুন্দর; জিনিসটা কি সুন্দর—এটা একটা অন্য ব্যাপার; কিন্তু কি সুন্দর লাগছে, এটাকে আমি আরও ছুঁতে চাইছি, এটাকে ধরে রাখতে চাইছি,—এটা একটা আলাদা জিনিস। রাজযোগে বলছেন, চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও অহংকার; চিত্ত হল যেখানে সমস্ত রকমের তথ্য আসছে, মন হল যেখানে বিচার করতে থাকে, আর বুদ্ধি হল জিনিসটাকে নিশ্চয় করে দেয়। আপনি কারুর হাত স্পর্শ করলেন, স্পর্শ করে বলছেন, বাঃ কি নরম তুলতুলে হাত, এটা বুদ্ধি বলে দিচ্ছে। অহংকার কি করে? আমি এর সাথে জুড়ে যেতে চাই। এতদিন দেহ একভাবে সব কিছু করে এসেছে, মন একভাবে সব কিছু করে এসেছে, কিন্তু আত্মাই যে রাজা, এখন মন এটা জেনে গেছে। এখন তিনি সংসারে যে কোন কাজ করবেন—সংসার সাধন, সংসার ক্রিয়া, সংসার ব্যবসা, যেভাবেই আপনি নিন, তখন কি হবে? ঠাকুর পরের লাইনেই বলছেন।

আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি। যেমন বলান, তেমনি বলি। আগের লাইনে বললেন, আমার দেবভাব প্রায় হত, পরিষ্কার বলছেন, আমি সেই দেবতা, অবশ্যই তাই। আত্মার শুদ্ধ প্রকাশ এসে গেছে কিনা, নিজেকে আত্মা বলে বোধ হচ্ছে। সেইজন্য বলছেন, তখন পূজো না করলে

শান্ত হতুম না। সেই মা কালী যিনি বিগ্রহ হয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আবার ঠাকুরের ভিতরেও আছেন। সেইজন্য প্রাণকৃষ্ণকে বলছেন—তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাস করি। প্রাণকৃষ্ণ যদি বলেও দেন, মহাশয় এটা ঠিক, ওটা ভুল; ঠাকুর যদি তাঁর কথা শুনে করতে যান, করতে পারবেনই না। কারণ ঠাকুর যখন প্রাণকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন, কি বল? ওটা ওনার মনের জিজ্ঞাসা। করার ব্যাপারটা যখন আসবে, তখন তাঁর ভিতরে যিনি আছেন, তিনি যেমনটি বলান তেমন বলি, যেমনটি করান, তেমন করি।

ঠাকুর যে বারবার বলছেন, সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়, সব ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় এই বোধটা এই অবস্থায় হয়। যতক্ষণ শুদ্ধির সেই অবস্থা না হয়, ততক্ষণ এটা বোধ হয় না যে, সবই তাঁর ইচ্ছাতে হয়। আপনি বলবেন, কেন ভাব আরোপ করব, চেষ্টা করব। অবশ্যই করবেন, কিন্তু যাঁরা ভাব আরোপ করেন, তাঁদের বেশির ভাগকেই দেখবেন, এরা হয়ে যান এক-একটা প্রতারক। ভাব আরোপ করার জন্যও প্রস্তুতি দরকার, প্রস্তুতি না থাকলে, ঠাকুর যেমন বলছেন, নিজেকে ঠকায় পরকে ঠকায়। বৈষ্ণবরা সাধারণ ভাবে বিনয় ভাব নিয়ে থাকেন। মহাপ্রভু বলে দিয়েছেন, ভাব আরোপ করতে হবে, তাই বিনয়ের ভাব আরোপ করছেন। কিন্তু অহঙ্কারটা যাবার না, ‘আমি বেশি বিনয়ী’, ‘ও কম বিনয়ী’; বিনয় নিয়েই মারামারি শুরু করে দেয়। আরেকটা হল ঠাকুরের ইচ্ছা, মায়ের ইচ্ছা। বাংলায় প্রবাদ আছে, নিজের বেলায় আঁটিশুটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি। নিজের ব্যাপার যখন আসে তখন ঠাকুরের ইচ্ছা, মায়ের ইচ্ছা থাকে না। অপরকে যখন ঠকাতে হয়, হাতের কাছে কোন উত্তর যখন না থাকে, তখন বলবে, ঠাকুরের ইচ্ছা। এগুলো হল মানুষকে ঠকানো।

মন যাঁর একটা শুদ্ধস্তরে চলে গেছে, যেখানে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, মা সব তুমিই করছ, কিন্তু লোকে বলে করি আমি, সকলই তোমারই ইচ্ছা। এই জিনিস এমনি এমনি হয় না, মন শুদ্ধ না হলে হয় না। তার আগে যদি কেউ এই কথা বলতে থাকে, সে পরকে ঠকায়, নিজেকে ঠকাচ্ছে। ঠাকুর রামপ্রসাদের গানের দুটো লাইন বলছেন –

প্রসাদ বলে ভবসাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা।  
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা।।

ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল জায়গায় গিয়ে পড়ল, কখন বা ঝড়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল—ঝড় যেদিকে লয়ে যায়।

এগুলো পড়লে আমার খুব মজা লাগে। মজা লাগে এই ভেবে যে, আমার ইউটিউবের লেকচার কেউ বেশি শোনে না, যাঁরা খুব পপুলার বক্তা, যাঁদের চ্যানেল খুব পপুলার, তাঁরা এদিকে লেকচার দেন, আর ওদিকে দশ হাজার ভিউ হয়ে যায়। যাঁরা আরও পপুলার তাঁদের এক দিনেই আট লক্ষ ভিউ হয়ে যায়। এখানে থিয়োরিটিক্যাল একটা জিনিস ভাবুন, কোন একজন পপুলার বক্তা, তিনি বলছেন, ‘আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী’, ‘ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল জায়গায় পড়ল, কখন বা ঝড়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল’, দেখা যাবে একদিনে দশ হাজার ভিউ। আর এখানে অবতার নিজে বলছেন, এই যে বলা হল অবতার শপিং মলের মত, কুবেরের ভাণ্ডারের যেমন ইতি করা যায় না, যাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইতি করা যায় না, ঠাকুর হলেন সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর অনুভূতির কুবেরের ভাণ্ডার, ইতি করা যায় না। সেই অবতার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে একা একা বসে আছেন, আর এ-সব কথা বলছেন। শুনছেন কে? প্রাণকৃষ্ণ, যাঁর নাম কথামতে না এলে কেউ জানতে পারত না। আপনাকে যদি লোকেরা না জানে, আপনাকে যদি কেউ পাত্তা না দেয়, মন খারাপ করবেন না, অবতারেরই এই দূরবস্থা। উচ্চতম কথা, শ্রেষ্ঠতম কথা, গভীরতম কথা বলছেন, কিন্তু কেউ শোনার নেই। শোনার জন্য কে আছেন? ওই এক প্রাণকৃষ্ণ। এখন ইন্টারনেট আদি হয়ে গেছে, বেলেড় মঠে একজন বক্তৃতা দিলে আট থেকে দশ হাজার লোক শুনবে। রেকর্ডিং করে ইউটিউবে ছেড়ে দিন, একদিনে দশ হাজার ভিউ।



তারমধ্যে বর্জনা, আবর্জনা যা মেশাবার মিশিয়ে থাকুন, আপনার digested, undigested, pre-digested যা আছে সব বলে যান, লোকেরা তাই খাবে। ঝালমুরির মশলার মত লেকচারে যত মশলা থাকবে, লোকেরা তত বেশি খাবে। অথচ অবতারকেই কেউ শুনছে না। একটার পর একটা কথা বলে যাচ্ছেন, যাতে প্রাণকৃষ্ণ একটু বুঝতে পারে। হে প্রাণকৃষ্ণ এগুলো আমি কিছু করি না, তোমাকে বললাম ঠিকই, কিন্তু তোমার কথা আমি নিতে পারব না।

**তাঁতি বললে, রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হল, রামের ইচ্ছায় আমাকে পুলিশে ধরলে—আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে।** ঠাকুর সেই তাঁতির গল্প বলেছিলেন। যে তাঁতির কথা বলছেন, সে ঠাকুরের মত উচ্চ অবস্থায় পৌঁছায়নি, কিন্তু এই যে বোধ, আমি আর আমার ভিতরে যিনি আছেন, দুটো আলাদা। তিনিই করাচ্ছেন, আমি করছি। আমি করছি এটা কে? যে শরীর মনের সঙ্গে জুড়ে আছে। তিনি করাচ্ছেন, এই বোধটা কোথা থেকে আসছে? যে মন আত্মার সঙ্গে জুড়ে আছে, সেই মন থেকে। কিন্তু আমাদের মন আত্মা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

কঠোপনিষদে যমরাজ খুব সুন্দর নচিকেতাকে বলছেন—*পরার্থি খানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূতমাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্নন। স্বয়ম্ভূ, সেই ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করে তার ভিতরে আত্মাকে রেখে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির সংযোগগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। সেইজন্য, তস্যাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্নন, ইন্দ্রিয়গুলি ভিতরের দিকে তাকায় না, শুধু বাইরের দিকে তাদের দৃষ্টি। আত্মার সাথে আমাদের সংযোগ এমন বিচ্ছিন্ন যে, এটাকে মানারও দম নেই যে সব তিনি করাচ্ছেন। ধর্মের কথা বলতে গেলে খুব ভাল মানুষ হলে বলবে, ‘মহারাজ আমার কি এখন বয়স হয়েছে এসব ধর্মের কথা শোনার?’ সেখান থেকে নেমে যাবে—ধুস্ সব আজগুবি কথা। ওখান থেকে একটু যুক্তিবাদীদের দিকে গেলে বলবে, ধর্ম হল সমাজের আফিং। আমাদের শাস্ত্রও তাই বারবার বলছেন, আত্মতত্ত্বের কথা শুনতে পাওয়া দুর্লভ, শুনতে পেলেও আত্মতত্ত্বকে বোঝা অসম্ভব। শুনল, বুঝল, তারপরেও বেশি লোক আত্মতত্ত্বকে নিতে পারে না। নচিকেতাকে যমরাজ এটাই বলছেন—*শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ*—আত্মতত্ত্বের কথা বেশির ভাগ লোকের শোনারই সুযোগ হয় না, শুনলেও বেশির ভাগ লোক ধারণা করতে পারে না।*

**হনুমান বলেছিল, হে রাম, শরণাগত, শরণাগত;—এই আশীর্বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।** হনুমান এখানে সেই অন্তর্যামী, ঠাকুর যাঁকে বলছেন, এর ভিতরে একজন আছেন, এটাকে বাইরে শ্রীরামের উপর রেখে এই কথা বলছেন। ব্যাপারটা একই। যখন আপনি ঈশ্বরকে বাইরে দেখছেন, তখন হল তিনি চালাচ্ছেন; যখন ভিতরে দেখছেন, তখনও বলছেন, তিনি চালাচ্ছেন। মালিক কিন্তু সব সময় তিনিই থাকবেন।

কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষু অবস্থায় বললে, রাম, যখন সাপে ধরে তখন ‘রাম রক্ষা কর’ বলে চিৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধনুক বিঁধে মরে যাচ্ছি, তাই চুপ করে আছি। ঠাকুর খুব সাধারণ একটা প্রচলিত কাহিনী বলছেন। শ্রীরামচন্দ্র একবার কোথাও জলাশয়ের পারে ধনুকটাকে মাটিতে গেঁথে দাঁড় করে রেখেছেন। পরে ধনুকটা তুলে দেখছেন ধনুকে রক্ত লেগে আছে। তারপর দেখছেন ওখানে একটা কোলা ব্যাঙ। শ্রীরামচন্দ্র তাকে বললেন, ‘তোমার শরীরে যন্ত্রণা হতে তুমি কিছু বললে না কেন? তখন কোলা ব্যাঙ বলছেন, ‘রাম, যখন সাপে ধরে তখন ‘রাম রক্ষা কর’ বলে প্রার্থনা করি, আর এখন স্বয়ং রামের ধনুক বিঁধে মরে যাচ্ছি। তোমারই ধনুক আমাকে বিদ্ধ করে দিয়েছে, আমি কার কাছে প্রার্থনা করব?’ এটা কিন্তু একটা উচ্চ অবস্থা। আমরা আগেও অনেকবার বলেছি, একটা বাচ্চা যখন জগৎ থেকে মার খায় তখন সে মায়ের কাছে দৌড়ে আসে। কিন্তু কোন কারণে মা যদি রেগে যায়, রেগে গিয়ে বাচ্চাক চড় মারে, বাচ্চা তখন কি করে? বাচ্চা মায়ের পা দুটি জড়িয়ে শাড়ির আঁচলে ঢুকে যায়। মা তখন আর কি করবে, বুকো লাগিয়ে নেয়। কিন্তু কথাটা সেই একই থেকে যাচ্ছে। যদি একবার বোঝেন ঠাকুর মারছেন, আপনারা ভক্ত, বিশ্বাস করুন সমাজ সহজে আপনাদের মারতে পারবে না। যাঁরা অনেক

দুঃখ-কষ্টে আছেন, বুঝবেন সমাজ আপনাকে সহজে মারতে পারবে না, কারণ আপনি ঠাকুরের লোক। ঠাকুর নিজেই আপনাকে মারবেন। আগেকার দিনে গ্রামেগঞ্জে কোন ছেলে দুষ্টুমি করলে বাড়ির লোকেরা বলত, আমরা ওকে শাস্তি দেব, তুমি দেবে না। যাঁরা ঠাকুরের শরণাগত, মুখেও যদি অন্তত দুবার বলে থাকেন, ঠাকুর আমি তোমার শরণাগত; ঠাকুর এবার আপনার দায়ীত্ব নিয়ে নিলেন, তিনি মারবেন। দুটোর মধ্যে একটা, যদি এটা বুঝে নেন ঠাকুরই মারছেন, তাহলে এই কোলা ব্যাণ্ডের মত চুপ থাকুন। আর তা নাহলে একজন ভক্তের মত কেঁদে কেঁদে ঠাকুরকে আরও জড়িয়ে ধরুন। এই দুটো —কষ্ট ঠাকুরই দিয়েছেন, এই ভেবে চুপ, আর দুই, শুধু ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে রাখা, অন্য কারুর কাছে না যাওয়া। সাধারণ মানুষ নিজের দুঃখের কথা চারিদিকে বলে যাবে, সুখেও তাই। সুখটাও তিনি দেন, দুঃখটাও তিনি দেন। সুখেও বেশি লাফালাফি করতে নেই, দুঃখেও দুঃখের ফিরিস্তি চারিদিকে বলে বেড়াতে নেই, চুপ থাকুন। কোলা ব্যাণ্ড এই স্তরের ভক্ত।

**আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হতো —এই চক্ষু দিয়ে —যেমন তোমায় দেখছি! এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়।** আমরা যেখানে পানের দোকান ও শপিং মলের কথা বলেছিলাম, কুবেরের যে খাজানার কথা বলা হল, সবটাই তাই, ঠাকুরের ভাব পাল্টাচ্ছে। আমরা যে আচার্যদের কথা পড়েছি, যে মহাপুরুষদের জীবনী আমরা পাই, সেখানে কোথাও এত ভ্যারাইটি পাওয়া যায় না। ঠাকুর চর্মচক্ষু দিয়ে ভগবানকে দেখছেন। তিনটে জগৎ —স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। আমাদের সবারই মন চব্বিশ ঘন্টা স্থূল জগতেই বাস করে। কদাচিৎ কখন ধ্যানের উচ্চ অবস্থায় গেলে সেখানে সে সূক্ষ্ম জগতে যেতে পারে। যাদের মন সূক্ষ্ম জগতে যায়, তাঁরা ধ্যানের গভীরে, ভাবের অবস্থায় ঠাকুরকে দেখতে পারেন। স্থূল জগতে এই ধরণের যা কিছু দর্শনাদি হয়, এগুলো সবই চিন্তন, কল্পনা। মন যদি সূক্ষ্ম জগতে চলে যায়, তখন ঠাকুরের দর্শন হতে শুরু হয়। কিন্তু সেটা ভাব অবস্থায় হয়। কারণ জগতে কদাচিৎ কেউ কখন কখন যেতে পারেন। শ্রীশ্রীমা স্বামীজীকে নিয়ে বলছেন, এই চর্মচক্ষু দিয়ে ভগবানকে কে দেখেছে? এক ঠাকুর দেখেছিলেন, আর-এক নরেন। এনারা হলে কারণ জগতের। কারণ জগতের অর্থ, আমরা যাকে বৈকুণ্ঠধাম বলি, শিবলোকের কথা বলি; এনারা হলেন সেখানকার; এনারাই শুধু দেখতে পারবেন। কিন্তু তাও সব সময় দেখতে পারবেন না; কারণ তাঁদের মন কখন স্থূল জগতে, কখন মন সূক্ষ্ম জগতে, কখনও কারণ জগতে থাকছে। দুটো জগতের মধ্যে এই যে এনাদের বাচখেলা, সেটাও ওনাদের নিজের ইচ্ছায় হয় না। ভিতরে যিনি আছেন তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। যাঁর সঙ্গে আপনার ভাল সম্পর্ক, যাঁকে আপনি ভালবাসেন; আপনি তাঁকে বললেন আপনারা যাবেন, তিনি বললেন আজকে আমি এই ড্রেস পরে যাব, উনি ওই ড্রেসে যাবেন, আপনার কিছু করার নেই। ভগবান বলে দিলেন, এখন প্রত্যক্ষ দর্শন, ভগবান বলে দিলেন, এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হবে, যেমন বলে দেবেন, তেমনটাই হতে হবে।

**ঈশ্বরলাভ হলে বালকের স্বভাব হয়। যে যাকে চিন্তা করে তার সত্তা পায়।** এই যে বলছেন, যে যাকে চিন্তা করে তার সত্তা পায়, এটা একটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। পরে আলাদা করে যখন আসবে, তখন আবার আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করব।

যাঁরা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন, তাঁদের বেশির ভাগই জানেন না, তাঁরা আসলে কি চান। আমাদের এক খুব শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় মহারাজ ছিলেন, শ্রীমৎ স্বামী চন্দ্রানন্দজী মহারাজ, যাঁর কাছে আমি জয়েন করেছিলাম। উনি দেওঘর আশ্রমে সেক্রেটারী ছিলেন, পরে পাটনাতে ছিলেন, সেখানে তাঁর শরীর যায়। আমি আমার বই The World of Religion, ওনার নামে উৎসর্গ করেছি। আমাকে সাংঘাতিক ভালবাসতেন। মৃত্যুর সময় বার বার আমার খোঁজ করছিলেন, আমি তখন বাইরে গিয়েছিলাম। আমাকে খবর পাঠানো হল। খবর পেয়ে আমি দৌড়ে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য স্টেশনে নেমে সোজা তাঁকে দেখতে চলে গিয়েছিলাম। মহারাজ প্রায়ই বলতেন, যাঁরা সাধু হন, বেশির ভাগ সাধুরা জানেনই না সাধু কেন হয়েছেন ও সাধু-জীবনের উদ্দেশ্য কি। আমি তখন ভাবতাম মহারাজ কেন এই ধরণের কথা বলতেন। এখন আমার বয়স হয়ে গেছে, এখন মহারাজের কথাটা বুঝতে পারছি যে সত্যিই তাই। আগে

রামকৃষ্ণ মিশনকে ভালবাসতাম, সাধুদের ভালবাসতাম; এখন আস্তে আস্তে আমার চিন্তা-ভাবনা স্থির হচ্ছে। আমি তাই সবাইকে বলি, আগে দেখুন, আপনি কি চান? মুখে বলে দেবেন, আমি ঠাকুরকে চাই। ঠাকুরকে ছেড়ে দিন, আরও নীচে নামুন। পরিষ্কার ভাবে বলুন এক, দুই, তিন, চার এই চারটে জিনিস আমি চাই। যদি দেখেন আপনার চারটেই হল আধ্যাত্মিক জীবনকে নিয়ে, তাহলে আপনার যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, যাবতীয় যত কাজ, সেই রকমই হবে। কারণ যে যাকে চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। আপনি যাঁর সঙ্গ করেন আপনি তাঁরই চিন্তা করবেন।

আপনি হয়ত এখন অনলাইনে গীতার ক্লাশ শুনছেন, ক্লাশের পর আপনি কি করবেন? আপনি কি টিভি সিরিয়াল দেখতে বসে যাবেন? আপনি কি ফেসবুকে সারাদিন খুটুর খুটুর করতে থাকবেন? তার মানে আপনার মন চাইছে মনোরঞ্জন, তার মানে আপনার মনটা হাঙ্কা ধরণের মন। মনটাও তাই আপনার হাঙ্কা জিনিস নিয়ে থাকতে চাইছে। তাহলে আপনি কি পাবেন? সত্তাটা পাবেন হাঙ্কার। কিন্তু আত্মা হলেন গুরু অর্থাৎ ভারি। যদি আপনি একবার ঠিক করেন, কি চাইছি? তাহলে আপনার যে সঙ্গ, আশেপাশে যা আছে, এটা আপনাকে পাল্টে দিতে হবে। এই যে বলা হয় A man is known by the company he keeps। এখানে আরও, আপনি যার সঙ্গ করবেন, আপনি সেটাই হয়ে যাবেন। উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বলছেন –

**ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়। বালক যেমন খেলাঘর করে, ভাঙে গড়ে –তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোনও গুণের বশ নয় –তিনিও তেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত।**

তাই পরমহংসেরা দশ-পাঁচজন বালক সঙ্গে রাখে, স্বভাব আরোপের জন্য। স্বভাব আরোপ নিয়ে ঠাকুর আবার পরে বলবেন, সেখানে বলবেন, যারা প্রকৃতির ভাব আরোপ করে তাদের কাম, ক্রোধ আদি চলে যায়। এখানে অন্য জিনিসের আলোচনা হতে চলেছে।

ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। আমরা মনে করছি ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের কষ্ট হচ্ছে, আসলে তিনিই তো সব কিছু হয়ে আছেন। স্বপ্নে আমরা কত কিছু নির্মাণ করছি, স্বপ্নে ওগুলোর স্থিতিও হয়, ঘুম ভাঙলে লয় হয়ে যায়। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভগবানের কাছে ঠিক এভাবেই হয়। স্বপ্নের কোন চরিত্রের আপনাকে বলার কোন অধিকার নেই, তুমি কেন আমায় সৃষ্টি করলে? হয়ত বলেও দিতে পারে, আপনি হয়ত স্বপ্নে শুনতেও পেলেন। আপনি কিন্তু তাতে পাল্টাবেন না, যা ছিলেন তাই আছেন। স্বপ্নে কিছু সৃষ্টিও করলেন, সেই চরিত্রগুলো থাকল, বেশ কিছু কাহিনী হল, মিটেও গেল, তারপর অন্য কাহিনী চলে এলো। এক রাত্রের একটি স্বপ্নের মধ্যে এত কিছু হয়ে গেল। ঘুম ভেঙে গেল, সব মিটে গেল, আবার আপনি যে কে সেই।

ঠাকুর এটাকে সহজ করে বলছেন, কিছু কিছু মতে ভক্তিশাস্ত্রেও আছে, **ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়। বালক যেমন খেলাঘর করে, ভাঙে গড়ে –তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোনও গুণের বশ নয় –তিনিও তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত।** ভগবান বালকের মত সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের যে কথা বলা হল, এগুলোর আসলে বাস্তবিক সত্তা নেই। এর সত্তা ঠিক ততটুকু, যতটুকু মানুষের স্বপ্ন স্থায়ী থাকে। স্বপ্নের চরিত্রগুলো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে পারে, ভালবাসতে পারে, আপনিও ওই স্বপ্নের মধ্যে একটা চরিত্র হয়ে সবই করছেন; ঘুম ভাঙলে সব শেষ। ঠাকুর পরে বলবেন, সহজ না হলে ঈশ্বরকে জানা যায় না।

আমরা এখনও ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩ সাল, সোমবার, এই দিনের আলোচনায় আছি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন, প্রাণকৃষ্ণের সাথে কথা বলে যাচ্ছেন। কথামতে ঠাকুর সাধনা, সিদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তি বা বস্তুলাভ, এই তিনটে জিনিসকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোচনা করছেন। এই তিনটে –প্রথম আসে সাধনা;

দ্বিতীয়, সাধনায় যেমন যেমন এগোচ্ছেন তেমন তেমন আপনার কি কি হয় আর তৃতীয়, শেষে সিদ্ধিলাভ। কথামূতে এই তিনটে জিনিসই ঘুরে ঘুরে বেশি আসতে থাকে।

কথা বলতে বলতে ঠাকুর বলছেন, যে যাকে চিন্তা করে তার সত্তা পায়। এর আগে আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি। এরপর ঠাকুর আরও বলছেন, পরমহংসরা দশ-পাঁচজন বালক সঙ্গে রাখে, স্বভাব আরোপের জন্য। জ্ঞানীরা, যাঁরা ঠিক ঠিক ধর্ম জগতে আছেন, তাঁদের পক্ষে সংসারীদের সাথে বাক্যালাপ করা খুব মুশকিল। আমার পরিচিত কয়েকজন আছেন, ওনারাও বলেন, ধর্মজগতে মন এত বেশি চলে গেছে যে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মেলামেশা করা, সামাজিকতা করা, পার্টিতে যাওয়া, পিকনিকে যাওয়া, এগুলো আর ভাল লাগে না; বিশেষ করে রোজ একটা করে আমাদের ক্লাশ যাঁরা শুনছেন, তাঁরা সবাই এই কথা বলছেন। এক জায়গায় ঠাকুর নিজের সাধনার ব্যাপারে বলতে গিয়ে খুব সুন্দর বলছেন, যারা ছিল আপন তারা হল পর, যারা ছিল পর তারা হল আপন। বাইবেলে বর্ণনা আছে, যীশুখ্রীষ্ট সিদ্ধিলাভ করে ধর্ম প্রচার করছেন। এক জায়গায় একজনের বাড়িতে বসে উনি ধর্ম প্রচার করেছেন। সেই সময় ওনাকে খবর দেওয়া হল—আপনার, মা, বোনেরা এসেছেন। যীশুখ্রীষ্ট তাদের বলছেন—কে মা, কে বোন, কে ভাই। ঈশ্বরের পথে যে আমার সঙ্গী, সেই আমার মা, সেই আমার বোন—অর্থাৎ ঈশ্বরের পথের সঙ্গী যাঁরা তাঁরাই আপনজন।

এগুলো বোঝা এমন কিছু কঠিন না। সমাজে এ-জিনিস হামেশাই দেখা যায়। ছোটবেলা স্কুলে পড়ার সময় এক রকমের বন্ধু হয়। স্কুলের পাঠ শেষ করে কলেজে গিয়ে বন্ধুর গোষ্ঠী পাল্টে যায়। কিছু দিন পুরনো বন্ধুদের সাথে সংযোগ রাখার চেষ্টা থাকে। মানসিকতা এমন হয়ে যায় যে, সেই চেষ্টাটাও দুর্বল হয়ে বন্ধু গোষ্ঠী পাল্টে যায়। জীবনধারা পাল্টে যাওয়ার সাথে সাথে বন্ধুও পাল্টে যায়। যারা ডাক্তার হয় তাদের বন্ধুদের মধ্যে ডাক্তারদের সংখ্যা বেশি হয়ে যায়।

এখানে ঠাকুর বলছেন, পরমহংসরা ভাব আরোপ করার জন্য পাঁচ-দশজন বাচ্চাদের সঙ্গে রাখেন। বাচ্চাদের কোন কিছুতে আঁট নেই, কোন কিছুকে ধরতেও যতক্ষণ, ছাড়তেও ততক্ষণ। ঠাকুর বাচ্চাদের বন্ধুত্ব প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। যখন বন্ধুত্ব হয়, এমন বন্ধুত্ব হয় যে দেখে মনে হয় এরা দুজন এক অপরকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না। কোন কারণে দুজন আলাদা হয়ে গেল, কিছুক্ষণের মধ্যে মন থেকেও নেমে গেল। পরমহংসরাও এই রকমই হন; যতক্ষণ আপনি আছেন ততক্ষণই আছেন। সাধারণ লোকেরা এগুলো দেখে ভুল বোঝেন। সেইজন্য পরমহংসরা কারুর সাথে মিশতে চান না, এমনিতেও এই পথের সাধকদের বেশি কারুর সাথে মিশতেও নেই। কারণ বেশি মেলামেশা করতে গেলে সেখানে প্রত্যাশা এসে যাবে, আমি কিছু পাব। এনারা অন্য জগতের লোক। এরপর কথামূতে মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন—

আগরপাড়া হইতে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা আসিয়াছেন। ছেলেটি যখন আসেন ঠাকুরকে ইশারা করিয়া নির্জনে লইয়া যান ও চুপি চুপ মনের কথা কন। ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসেন তাঁদের অনেকেই ঠাকুরকে আলাদা মনের কথা বলেন। তিনি নূতন যাতায়াত করিতেছেন। আজ ছেলেটি কাছে আসিয়া মেঝেতে বসিয়াছেন। আজকে আর আলাদা করে ঠাকুরকে ডেকে না গিয়ে নিজেই ঠাকুরের কাছে বসে ঠাকুরের কথা শুনছেন।

অনেকেই বসে আছেন, ঠাকুর ছেলেটির প্রতি উদ্দেশ্য করে কিছু বলছেন। আগে বলেছিলেন, যে যাকে চিন্তা করে তার সত্তা পায়। এটা হল ঈশ্বরের দিক থেকে। এরপরে সাধনার দিক থেকে বলছেন। তার মানে, আপনি যদি কৃষ্ণের চিন্তা করেন, কৃষ্ণের সত্তা পাবেন; শিবের চিন্তা করলে শিবের সত্তা পাবেন। বৈষ্ণবরা সেইজন্য বৈকুণ্ঠলোক, শিবলোকের কথা বলেন। কিন্তু ঠাকুর এখানে সাধনার দিক থেকে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছেলেটির প্রতি) –আরোপ করলে ভাব বদলে যায়। ঠাকুর কেন এই কথা বলছেন? একটা হতে পারে, যেটা উনি বলছিলেন সেটাই continue করছেন। দ্বিতীয় হতে পারে, ওখানে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কারুর মনে কোন একটা সংশয় ছিল, যেখানে সে আটকাচ্ছিল, সেটা বুঝে ঠাকুর এই কথা বলছেন। এই যে বলছেন, আরোপ করলে ভাব বদলে যায়, এটার উপর দু-মিনিট আলোচনা করা দরকার।

মূল সাধনা যখন হয়, আপনি যেভাবেই সাধনা করুন, যোগপথে সাধনা করুন, ভক্তিপথে সাধনা করুন, জ্ঞানপথে সাধনা করুন; জ্ঞানপথে সাধনা যাঁরা বেদান্তী সন্ন্যাসী শুধু তাঁরাই করেন; আমরাও পুরোপুরি ওই ভাবে করি না; তখন ওই সাধনার দুটি ভাব থাকে। একটা ভাব হল –এই সংসার মায়া, সংসারে আমি কিছু চাই না, ব্রহ্ম ছাড়া আমার কিছু লাগবে না। নির্গুণ নিরাকারের যাঁরা সাধক তাঁরা নেতি নেতি করে সবটাই ফেলতে থাকেন। পাথরের মূর্তি বানানোর মত, পাথরে ছেনি মেরে মেরে অবাস্তিত্ব পাথরগুলিকে সরিয়ে দিয়ে মূর্তিকে পাথর থেকে বার করে নিয়ে আসা।

দ্বিতীয় ভাব হল – একটা জিনিস আছে, এটাকে আমি পেতে চাইছি। ভক্তিপথ অনেকটা এই রকম। জ্ঞানপথে যেখানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও তৈরী করা হয়; ভক্তিপথে যেখানে আনা হচ্ছে, সেখানেও তৈরী করা হয়। দুটোতে খুব বেশি তফাৎ নেই, গভীরে গেলে দেখা যাবে দুটো একই। কিন্তু আমার আপনার যে স্তর, সেখানে দেখবেন; ঠাকুর বারবার বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু; বস্তু বলতে ঈশ্বর, বস্তু বলতে আত্মা; এই কথা ঠাকুর কথামতে অনেকবার বলেছেন। কিন্তু আমি আপনি পারছি না, মন কিছুতেই সেখানে যাচ্ছে না। একটা থাক হল, যাদের কোন চেষ্টা নেই, আরেকটা থাক হল যারা চেষ্টা করছেন। অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কখন ভিতর থেকে বিঘ্ন আসছে, কখন বাইরে থেকে বিঘ্ন আসে, আবার কখন কিছু না হলেও হঠাৎ কি এমন হয়ে যায় যে সব কিছু এলেমেলো হয়ে যায়। পতঞ্জলি যোগসূত্রে ব্যাধি, স্ত্যান, প্রমাদ, আলস্য এইসব বিঘ্নের কথা বলছেন। এগুলো এক রকমের; আবার এও আছে যে, চেষ্টা করলেও কিছু হতে চায় না।

তার সাথে আছে জীবনের মূল সমস্যাগুলি, যার মধ্যে আছে –কামিনী, কাঞ্চন, নামযশ। এই তিনটে মূল সমস্যা, তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু সমস্যা থাকে। আমরা এখানে খুব সহজ করে বলে দিচ্ছি –দুটো থাক। আমাদের মধ্যে কিছু গুণ আছে, যে গুণগুলি আমাদের ধর্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তেমনি কিছু বন্ধুত্ব হয়, ভালবাসা হয়, কিছু সঙ্গ হয়, যেগুলো ঈশ্বরের দিকে যেতে আমাদের সাহায্য করে। অন্য দিকে এমন অনেক কিছু আছে, যেগুলো আমাদের সংসারের দিকে টেনে নিয়ে চলে যায়। ঠাকুর খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে বলছেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনই ধর্মপরায়ণ, সেখানে একে অপরকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আবার বেশি কাছে ঘেঁষতে গেলে স্ত্রী স্বামীকে সরিয়ে বা স্বামী স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেয়। মানুষ যে স্বভাব দিয়ে নির্মিত, সেই স্বভাবের কিছু জিনিস তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আবার কিছু জিনিস সংসারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যমরাজ কঠোপনিষদে বলছেন, *যস্যাম্ মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ*, সংসারের এমন আকর্ষণ যে, যার জন্য মানুষ ওর মধ্যে একেবারে মজে যায়। মজে গিয়ে এমন ভাবে ডুবে যায় যে, ওখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না।

পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে এটাকে কাউন্টার করার জন্য খুব সুন্দর বলছেন –*প্রতিপক্ষ ভাবনা*। অন্তবীক্ষণ জীবনে প্রত্যেকের জন্য খুব জরুরী। রাজনীতিতে নির্বাচনে কোন পার্টি হেরে গেল, সেই পার্টি তখন বলে আমাদের অন্তবীক্ষণ করতে হবে। অন্তবীক্ষণ শিবির করে তারা বিশ্লেষণ করে আমরা কেন হেরে গেলাম, আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলিকে খুঁজে বার করতে হবে। বড় বড় কোম্পানীর লাভের পরিমাণ কমে গেলে বা লোকসান হলে বা কোম্পানীর কোন সমস্যা হলে বলে, আমরা একটু বিচার করে দেখব কোথায় আমাদের সমস্যা হচ্ছে। যিনি সাধক, তিনি দেখছেন আমি এগোতে পারছি না, পুরোমাত্রায় চেষ্টা আছে তাও এগোতে পারছেন না। আবার আছে চেষ্টা নেই, কিন্তু ইচ্ছা আছে। ইচ্ছে আছে কিন্তু

চেষ্টা করতেই পারছে না, শুরুই করা যাচ্ছে না, তখন বিচার করতে হয় আমাকে কে আটকাচ্ছে। যে পরিস্থিতির জন্য আটকাচ্ছে সেটাকে পাল্টানো আমাদের হাতে নেই, ওটা উপরওয়ালার হাতে। কিন্তু নিজের ভিতর যে দুর্বলতাগুলি আছে, সেগুলোর প্রতিকারের ব্যাপারে পতঞ্জলি বলছেন—প্রতিপক্ষ ভাবনা।

আপনারা অনেক ধর্মকথা শুনেছেন— কখন সত্ত্ব, রজো, তমোর কথা; কখন মায়ার কথা, কখন শক্তির কথা, কখন ব্রহ্মের কথা, কখন ঈশ্বরের কথা, কখন ঈশ্বরের কৃপার কথা, কখন পুরুষাকারের কথা; এগুলো সব কটা একটা প্ল্যাটফর্মে বাঁধা। আগেকার দিনে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এটা বিভিন্ন ভাবে আসত; ঠাকুর এটাকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। বাস্তবে এই সমস্ত জিনিসগুলো এক জায়গায় আছে। মন যতক্ষণ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ জপধ্যান শুরু করা যাবে না। সত্ত্বগুণের লক্ষণই হল জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও সুখ-শান্তির প্রতি আগ্রহ। সুখ-শান্তি বলতে এখানে বিষয়ভোগ না, এটা হল মনের প্রসন্নতা। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতাকে পরিভাষিত করছেন—*প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে*, মন যখন আনন্দে থাকে, তখন এই যে নানা রকম বিয়ের কথাগুলো বলা হল, এগুলো কেটে যায়—সত্ত্বগুণ এই প্রসাদটা দেয়। কেউ যদি আপনার সাথে কথা বলে, সে যে কেউ হতে পারে; তখন আপনার ভিতর থেকে কি আনন্দে হাসি ফুটে ওঠে? হাসি যদি না ফোটে তাহলে বুঝতে হবে, তাকে আপনার পছন্দ হচ্ছে না। দ্বিতীয়, সত্ত্বগুণের আধিক্য আপনার মধ্যে পুরোপুরি হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আপনাকে প্রতিপক্ষ ভাবনা করতে হবে।

প্রতিপক্ষ ভাবনা অনেক ভাবে হয়। একটা হল, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে যাওয়া। আর-একটা হয়, যে জিনিসটা আটকাচ্ছে, ঠিক তার বিরোধী কোন কিছু নিয়ে আসতে হবে। একজনের শরীরের ওজন বেড়ে গেছে। তাকে ডাক্তার ওজন কমাতে বলেছে। ওজন কমানোর জন্য ডাক্তার খাবারের চার্ট করে দিয়েছেন। সব শুনে সে ডাক্তারকে বলছে—আচ্ছা ডাক্তারবাবু এই যে খাবারের চার্ট করে দিলেন, এগুলো কি খাওয়ার আগে খাব, নাকি খাওয়ার পরে খাব। সে নিজের খাওয়াটা ছাড়বে না। আমরা যখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—হে ঠাকুর আমি যেন শুদ্ধ পবিত্র হই, আমার মন যেন নির্মল হয়। বাস্তব জীবনে আমরা কি এর কোন অনুশীলন করছি? আর যখন আমরা অনুশীলন করি, তখন মনে কি এই খেদ হয় যে, এই তো ঠাকুরের কাছে সকালে প্রার্থনা করলাম—হে ঠাকুর এ-রকম যেন না করি; তারপরেও এ-রকম করছি, এটা ভেবে মনে কি কোন গ্লানি আসে? গ্লানির ভাব যদি হয়, তাহলে বুঝবেন আপনি শীঘ্রই উঠবেন, আর বেশি দেৱী নেই। গ্লানির ভাব যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আপনি একজন জ্ঞানপাপী, আপনার এখনও সময় লাগবে। এই যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু নিজেকেও একটা চেষ্টা করতে হবে, সেটা হল আরোপ।

আরোপ জিনিসটা খুব সহজ। বাচ্চারাও মাকে বা বড় কাউকে ভয় দেখাতে একটা বাঘের বা সিংহের মুখোস লাগিয়ে ভয় দেখায়। যদি মুখোস না পায়, অন্তর সিংহের মত একটা গর্জন করে ভয় দেখাবে। পাটনার বইমেলার পর আমি কলকাতার এন্টালিতে ট্রেনে করে ফিরছিলাম। ট্রেনে আমার সহযাত্রী হিসাবে একটা ফ্যামিলি যাচ্ছিল—স্বামী, স্ত্রী আর ওদের একটা বাচ্চা। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আমাকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখে বাচ্চাটার মজা লেগে গেছে। রাত নটা বেজে গেছে, তখনও বাচ্চাটা থেকে থেকে আমাকে মুখে নানা রকম আওয়াজ করে আমাকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। আমি ভয় পাচ্ছি না দেখে ওর অবাক লাগছে। অনেক কষ্টে মা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। এটাই হল আরোপ করা। আমার শক্তি কম, আমার শক্তি বেড়ে গেছে মনে করে ধরে নিচ্ছি ওকে আমি দাবিয়ে দেব। আমরা যখন গর্জন করি, চেষ্টা করে কথা বলি, তখন আমরা ওই একই জিনিস করি, ভাব আরোপ করি। যখনই কারুর সাথে আমার অশান্তি লাগে, সে বাইরের লোক হোক বা আমাদের ভিতরের কেউ হন, একটার বেশি কথা আমি বলি না, আমাকে তাই ভাব আরোপ করতে হয় না। অনেকেই বলেন যে, রেগে গেলে আমি গলা চড়াই না, আরও শান্ত হয়ে যাই, ভাব আরোপ করতে হয় না। যার শক্তির অভাব সে শক্তির

ভাব আরোপ করে। ঠিক তেমনি, যে জিনিসে দুর্বলতা আছে, তাকে সেই জিনিসের ভাবটা আরোপ করতে হয়। স্বামীজী বলছেন, অনেক সময় উনি সিংহের হৃদয়ের উপর ধ্যান করতেন। প্রথম যখন এই কথাটা পড়েছিলাম আমি চমকে উঠেছিলাম —একেই তিনি সিংহ, তার উপর আবার সিংহের হৃদয়ের উপর ধ্যান করছেন, কি শক্তির আবির্ভাব হবে কল্পনা করা যায়!

যদিও ঠাকুর এখানে বেশি কিছু বলছেন না, একটা কথাই বলছেন। আপনি আগে দেখুন আপনার কিসের সমস্যা আছে, কি দুর্বলতা আছে। এরপর সেই দুর্বলতার maximum যেটা হতে পারে, নিজেকে সেটা মনে করা, আমি সেই; তখন মন থেকে ওই দুর্বলতাটা চলে যাবে। আসলে শরীরে তো কিছু হয় না, যা হয় মনের হয়। মনের দুর্বলতা চলে গেলে আস্তে আস্তে ওই সমস্যাটাও চলে যায়। ঠাকুর এই আরোপ নিয়ে কিছু মজার কথা বলছেন, যেমন একটা গল্প বলছেন। একজন বহুরূপী সাধুর বেশে এসেছে দেখে রাজা তাকে একটা টাকা দিতে গেল, সে নিলে না। কারণ সে সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করেছে। তারপর সাধুর সাজ খুলে মুখ ধুয়ে আবার রাজার কাছে ফিরে এসে বলছেন, ‘তখন যে টাকা দিচ্ছেলে, কই দাও সেই টাকা’। রাজা বললে, ‘তখন দিচ্ছিলাম নিলে না যে’? ‘তখন আমি সাধু সেজেছিলাম’। যাঁরা সন্ন্যাসী হন, গেরুয়া ধারণ করেন, ওই একই জিনিস করছেন, আরোপ করছেন। এই গেরুয়া হল সেই শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দের পরম্পরার, তাঁদের ভাবটা যেন আমার ভিতরেও আসে। শুনেছিলাম, বৌদ্ধদের একটা পরম্পরা আছে, বিশেষ করে বার্মায়, গৃহস্থরা সাত দিন কি পনের দিনের জন্য, অনেক সময় এক বছরের জন্য ভিক্ষুর ভেক ধারণ করেন। ওই কটা দিন ওনারা পুরোপুরি ভিক্ষুর আদর্শে জীবন-যাপন করেন। পুরোপুরি ভিক্ষু হয়ে যাওয়া তো যাবে না, যে কটা দিন থাকা যায়। ঠাকুরও নির্জনবাসের কথা বলছেন, একই জিনিস। এখানে ঠাকুর যেটা বলছেন, এটা তিনি কাম ভাবকে নিয়ে বলছেন। কাম ভাব হল মূল ভাব, যেটা সাধকদের প্রচুর সমস্যা তৈরী করে।

**প্রকৃতিভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়।** এখানে কামাদি বলছেন, কাম হল মূল ভাব। ঠিক তেমনি যদি প্রচুর ক্রোধ থাকে, কারুর প্রতি হিংসা ভাব থাকে, সেখানে যদি মৈত্রী ভাব আরোপ করা যায়, যে মৈত্রী ভাব থেকে বলতে পারবে সবাইকে আমি ভালবাসি, সবাই আমারই সন্তান; এই ভাব আরোপ করলে হিংসা, ক্রোধাদি রিপুগুলো কেটে যায়। সবার প্রতি ভালবাসা, সবাই আমার নিজের সন্তান, ঈশ্বরদর্শনে তো এটাই হবে। যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়, তাঁরা তো এটাই দেখবেন, সবাই আমার সন্তান, আমার থেকেই বেরিয়েছে বা আমি ঈশ্বরের সন্তান, সবাই ঈশ্বরের সন্তান, সবাই আমার আপন ভাই/বোন। সন্ন্যাসীর মন্ত্রও তাই —*মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, সব কিছু আমার থেকেই বেরিয়েছে।

ঠাকুর এখানে বলছেন প্রকৃতিভাব আরোপ করতে, প্রকৃতিভাব মানে নারী ভাব, তাতে কামাদি রিপুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। **ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের নাইবার সময় দেখেছি —মেয়েদের মতো দাঁত মাজে, কথা কয়।** ঠাকুরের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সাংঘাতিক ছিল। আগেকার দিনে মেয়েরা অভিনয় করত না; নাটক, যাত্রাতে মেয়েদের চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করত আর মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করতে করতে ওদের আচার আচরণ মেয়েদের মতই হয়ে যেত।

গুরু আমাদের ইষ্ট মন্ত্র দিয়ে বলে দিয়েছেন সকাল সন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করতে। বলে দিয়েছেন, স্নানাদি করে, শুদ্ধ পবিত্র হয়ে পবিত্র স্থানে বসে জপ করবে। শোয়ার জায়গায় বা যেখানে বসে অন্যান্য কাজ করা হয়, সেখানেও আমরা বসতে পারি, না বসার কিছু নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি জায়গায়, স্থানে তন্মাত্রার ব্যাপারটা থাকে, ফলে সব জায়গায় সাধন-ভজন হয় না। পবিত্র স্থানে জপধ্যানের সঙ্গে যদি এই ভাব আনা হয় —আমি ঠাকুরের সন্তান; খুব নামকরা গান —আমরা মায়ের ছেলে; এই গান হল ভাব আরোপের জন্য। দিনে এক ঘণ্টা কি দু ঘণ্টা যদি এই সাধনা করা হয় —আমি ঠাকুরের সন্তান, আমি মায়ের সন্তান; সন্তান এই দেহরূপে না, আত্মরূপে; আমাদের ব্যবহারটাই পাল্টে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার সাহিত্যে আমরা কত ঘটনা পাই। ঠাকুরের শিষ্যদের যখন কোন কিছু দান দেওয়া হচ্ছে,

গ্রহণ করতে চাইছেন না; কারণ ঠাকুর ছিলেন ত্যাগের বাদশা, আমরা তাঁর সন্তান হয়ে কি করে গ্রহণ করব! আপনিও ঠাকুরকে যে রূপে দেখবেন, বাইরেও সেটাই যেন আপনার ব্যবহার হয়। বৈষ্ণবরা এটাকেই সারুপ্য বলে, বাকিগুলো হল সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। সারুপ্য মানে ঈশ্বর যে রূপে আছেন সেই রূপকে আরোপ করে সাধনা করলে মৃত্যুর পর তাঁরা বৈকুণ্ঠধামে গিয়ে সেই রূপ পেয়ে যান। অনেকে ঠাকুরের মত ধৃতি-জামা পরেন; বাচ্চাদেরও অনেক সময় ঠাকুর, মা, স্বামীজীর মত সাজানো হয়, এটা অন্য জিনিস। রূপ মানে ঈশ্বরের যে ভাব, ভিতর থেকে ওই ভাবটা নিয়ে আসতে হয়, যেমন শুদ্ধভাব, পবিত্রভাব। ভক্তরা অনেক সময় আমাদের বলেন, মহারাজ আমি অমুক মহারাজকে জানি। খুব ভাল, মহারাজকে জানেন, কিন্তু ওই মহারাজের যে ভাব, ওনার যে জ্ঞান, ওনার যে ভক্তি, ওনার যে বৈরাগ্য, এগুলো কি নিজের ভিতরে আরোপ করেছেন কখন? বা কখন চেষ্টা করেছেন? বাচ্চারা অনেক সময় বাবার জামা গায়ে দিয়ে, জুতোটা পায়ে গলিয়ে মাকে বলবে, মা দেখ, আমি বাবা হয়েছি। আসলে বাচ্চা বড় হতে চাইছে। যে যেটা চায়, সে সেটার নকল করে, সেটার মধ্যে নিজেকে ঢালতে চায়। এটা যেমন একটা দিক, ঠিক তেমনি যে সমস্যা থেকে বাঁচতে চাইছেন, সেখানেও সেটাই হবে। আপনি বলছেন, যেটা আমি হতে চাইছি, এই সমস্যা আমাকে সেটা হতে দিচ্ছে না। যে জিনিসগুলো বাধা সৃষ্টি করছে, সেগুলোকে ওই ভাবে যদি আরোপ করা হয়, বাধাগুলো খসে যাবে। ঠাকুর এখানে খুব সহজ করে বলে দিচ্ছেন, প্রকৃতিভাব আরোপ করলে স্বভাব পাল্টে যায়।

ছেলেটিকে ঠাকুর বলে দিচ্ছেন—**তুমি একদিন শনি-মঙ্গলবার এস।**

**প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) —ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।** এর উপর আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। খুব সংক্ষেপে আরেকবার বলছি। ঠাকুরের অদ্বৈত তত্ত্বকে নিয়ে অনেক মতান্তর আছে যে, যেমন অনেকে ইদানিং বলতে শুরু করেছেন যে, ঠাকুরের যে অদ্বৈত, এই অদ্বৈত হল শাক্ত অদ্বৈত। যেমনি কেউ শাক্ত অদ্বৈত বললেন, কেউ শৈব অদ্বৈত বললেন, কেউ রামকৃষ্ণাঈত বলতে পারেন, কিন্তু এরপর সেটা কি করে আর অদ্বৈত থাকল? অদ্বৈত অদ্বৈত। এখন কত রকম অদ্বৈত আমরা শুনছি, কেউ বলছেন জ্ঞান অদ্বৈত, কেউ বলছেন বিজ্ঞান অদ্বৈত। এগুলো কি? অদ্বৈত অদ্বৈত। যাঁরা এই ধরনের কথা বলেন তাঁদের অনেকে পণ্ডিত, অনেকে মনে করেন পণ্ডিত হয়ে গেছেন। অতি সাধারণ কথা—অদ্বৈত মানে অদ্বৈত। সেই অদ্বৈত যখন দ্বৈত হয়ে সামনে আসেন, কেউ জানে না এটা কি করে হয়। অখণ্ড আর সৃষ্টিকে যে রেখা আলাদা করছে, সেই রেখার স্বরূপ কেউ জানে না। কেউ এই রেখাকে বলে প্রকৃতি, কেউ বলে শক্তি; কেউ বলেন সীতা, কেউ বলেন কালী, কেউ আবার বলেন দুর্গা। যার যেমন ভাব তিনি সেই ভাবানুযায়ী বলেন। ঠাকুর যখন বলছেন, ব্রহ্ম শক্তি অভেদ, বলা স্বাভাবিক। সেই ব্রহ্ম যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, যাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি বিদ্যমান; তিনি যখন সৃষ্টি করতে চাইলেন, তিনি এবার ইচ্ছামাত্র জগৎ সৃষ্টি করে দেবেন। এই যে ইচ্ছা যেটা এলো এটাই শক্তি, তাই এটাই obvious যে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও বলছেন, শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। কোথা থেকে যে এই নূতন নূতন সব শব্দগুলো নিয়ে আসছেন, ভগবানই জানেন।

প্রাণকৃষ্ণের মধ্যে বেদান্তের প্রভাব ছিল, তিনি বেদান্ত বেদান্ত করতেন। ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণের বেদান্তের ভাব দেখেই এই কথাগুলো বলছেন। **শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়।** বেদান্তীদের যেমন জগৎ মিথ্যা জগৎ মিথ্যা এই ভাব, ইদানিং কালে এটা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। কোথা থেকে লোকেরা এগুলো তুলে আনছে জানিও না। অনেক শ্রোতাবন্ধুরা আমাকে বলছেন, ‘মহারাজ আমাদের একটু আত্মবোধ পড়াবেন’? কিংবা বলবেন, ‘একটু বিবেকচূড়ামণি পড়াবেন’? ‘আত্মবোধ’, ‘বিবেকচূড়ামণি’, এগুলো প্রকরণ গ্রন্থ। এখানে আমরা এদের ঠাকুরদাকে আলোচনা করছি। এগুলো কারা রচনা করেছেন জানি না, সবটাই আচার্যের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। আচার্য হয়ত রচনা করেছেন, হয়ত করেননি। তবে মূল শাস্ত্রের নীচে কক্ষণ যেতে নেই। একজন খুব নামকরা বৈজ্ঞানিক, তিনি তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন—**Always read the Masters**, এটা কোন একটা বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে না,



যে কোন বিষয়ে, ফিজিক্স যদি জানতে চান, তাহলে আপনি সহায়িকা বই পড়তে যাবেন না, আপনাকে মূল বইতে যেতে হবে। বাংলা সাহিত্যকে জানতে হলে আপনাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়তে হবে – Always read the Masters। হিন্দু ধর্মের চারটে স্তরের প্রথম স্তম্ভ দর্শন যেটা উপনিষদ গীতা থেকে আসে, দ্বিতীয় স্তম্ভ ইতিহাস পুরাণ, যা বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণাদি গ্রন্থ থেকে আসে, তৃতীয় স্মৃতিমূলক গ্রন্থ, যার মূল গ্রন্থ হল মনুস্মৃতি, যাঙ্কবল্ল্য স্মৃতি আদি আর চতুর্থ পূজা অর্চনা, যা তন্ত্র বিধি শাস্ত্র থেকে আসে। এগুলোই হিন্দুদের মূল গ্রন্থ; হিন্দু ধর্মকে জানতে হলে সবাইকে এই মূল গ্রন্থগুলি অবশ্যই পড়তে হবে।

শঙ্করাচার্যের পর যত বেদান্তীরা এসেছেন, তাঁরা সবাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা যাঁরা ছিলেন, যেমন বৌদ্ধরা ছিলেন, পরে রামানুজ, আরও পরে মাধ্বাচার্য, এনাদের সঙ্গে যুক্তিতর্কের লড়াই করতে গিয়ে ব্রহ্মকে, ব্রহ্মের স্বরূপকেই এনারা ভুলে গিয়ে শুধু মায়া মায়া করে গেলেন, কারণ তা না হলে যুক্তি দাঁড় করাতে পারছিলেন না। আপনি যুক্তিতর্কের লড়াই করতে যাবেন, সেইজন্য আপনি মূল জিনিসটাকেই হারিয়ে ফেলবেন? আগামীকাল কারুর সঙ্গে যদি আমাকে ঠাকুরের অবতারত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তিতর্ক করতে হয়, তাহলে আমাদের যিনি ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি আমাদের চোখে অবতার, সেখানে কি আমি বলতে পারি, ‘না না শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক সেইভাবে অবতার নন’? শুধু তর্কে টিকে থাকার জন্য এই কথা কি কখন আমরা বলতে পারি? ঠাকুর ও স্বামীজী বারবার বলছেন, মায়াও যা শক্তিও তা, প্রকৃতিও তাই, সীতাও তাই, শ্রীশ্রীমাও তাই। এনারা হলেন সেই সীমারেখা, যে সীমারেখার মধ্যে পড়ে সেই অখণ্ডকে বিভাজিত বলে মনে হয়। এটাই ঠিক ঠিক বেদান্ত। ওনারা মানবেন না, মানার দরকার নেই। ঠাকুর একজনের কথায় বলছেন, তোমার কথা কি শুনব, আমি যে দেখেছি এই রকম।

ঠাকুর তাই স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়, আমি-তুমি, ঘরবাড়ি, পরিবার – সব মিথ্যা। ঠাকুর যখন কৃপা করে দেখিয়ে দেবেন, তখন ওই রূপে দেখবেন। যতক্ষণ দেখাচ্ছেন না, তখন আমাদের শক্তি রূপেই নিতে হয়। প্রথমে দিকে প্রকরণ গ্রন্থ একটু পড়তে হয় ঠিকই, কিন্তু এগুলো কখন তত্ত্ব কথা না। বেদান্ত-সার সদানন্দ লিখেছেন, ওটা সদানন্দের কথা, ওটা সদানন্দের বেদান্ত। বেদান্ত যদি জানতে হয়, তাহলে বেদের অন্ত উপনিষদই আমাদের সরাসরি পড়তে হবে। অর্থ যদি না বুঝতে পারি, তাহলে যাঁরা শ্রেষ্ঠ আচার্য তাঁদের ভাষ্য পড়তে হবে। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য পড়ুন, তাহলে বুঝতে পারবেন উপনিষদ কি বলতে চাইছেন। আর সবটাই সংস্কৃত পড়ুন, সংস্কৃত না জানলে শিখে নিন। ইন্টারনেটে সংস্কৃত শেখার কত ভাল ভাল সুযোগ করে দিয়েছে, সেটাকে কাজে লাগান। আচার্যের ভাষা অত্যন্ত সরল, একেবারে প্রাঞ্জল।

মায়ার সরল অর্থ করার সময় বলছেন মায়া মানে মিথ্যা। মায়ার অর্থ কিন্তু মিথ্যা না, মায়া মানেই যেটা যেমন সেটাকে ঢেকে দিয়ে অন্য রকম দেখিয়ে দিচ্ছে। মায়া একটা শক্তি, যিনি করছেন এটা তাঁরই শক্তি। ঈশ্বর যখন করেন তখন এটা ঈশ্বরেরই শক্তি, যখন জাদুকর করে তখন সেটা জাদুকরেরই শক্তি। নিজের দেহের বোধ, নিজের খাওয়া-পরা-থাকার বোধ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ এটা মায়া। মায়ার বদলে শক্তি বললেও কোন দোষ হয় না।

ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণকে এটাই বোঝাতে চাইছেন। ঠাকুর মায়া জিনিসটা যে বলবেন না, তা না, তিনিও মায়াকে নিয়ে বলবেন। কারণ সমাধির অবস্থায় যখন জ্ঞান হয়, তখন দেখেন সবই চৈতন্য। তখন বুঝতে পারেন চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। তাহলে এতক্ষণ যে এত কিছু দেখছিলাম? এগুলোও চৈতন্য। আচার্য শঙ্কর যদি জগৎকে মায়া মনে করতেন, তাহলে সমাধি থেকে নেমে কেন তিনি শিক্ষা দিতে নেমে গেলেন। জগৎ যদি সত্যিই না হয়, তাহলে শিক্ষা দেওয়ার দরকার কি? ঠাকুর, স্বামীজী এনারাও সমাধি থেকে নেমে এসে শিক্ষা দেওয়াটা বন্ধ করলেন না, কারণ এটা শক্তির এলাকা। যখন

শক্তির পারে চলে যাবেন, তখন দেখবেন এগুলো কিছুই নেই, সচ্চিদানন্দ সাগরেরই ঢেউ। যতক্ষণ ঢেউ দেখছেন, ততক্ষণ ওটা ঢেউ, ওটা সমুদ্র না।

**ওই আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।** স্বামীজী এক জায়গায় খুব সুন্দর বলছেন – যিনি জ্ঞানপথের তিনি জ্ঞান বিচার করেন। স্বামীজী সেখান উপমা নিয়ে আসছেন, শিব শব্দ হয়ে পড়ে আছেন, মা কালী শিবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, জ্ঞানী সেখানে বলে আমি আমার শক্তিতে একে জয় করব। ভক্ত বলে, না, আমি তা পারব না; আমি মায়ের সন্তান হয়ে প্রার্থনা করছি –মা পথ দাও। কারণ তিনি পথ না দিলে সেই শিবের কাছে আমি পৌঁছাতে পারব না, সেই শিব আমার জন্য শব্দ হয়ে থাকবেন, মানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমার কাছে নেই। সেইজন্য মার কাছে স্তুতি করতে হয়। যাঁরা মনে করেন ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, তাঁরা বলবেন, তোমারই স্বরূপ দেখি মা, তাতে কোন অসুবিধা নেই। তোমার স্বরূপকে জানাও যা, ঈশ্বরের স্বরূপকে জানাও তাই।

**কাঠামোর খুঁটি না থাকলে কাঠামোই হয় না –সুন্দর দুর্গা ঠাকুর-প্রতিমা হয় না।** এই জগতে যা কিছু সুন্দর আমরা দেখছি, কারণ শক্তি আছে বলে। কিন্তু আমরা কোনটাই বুঝতে পারিনা, এটাও বুঝতে পারিনা, ওটাও বুঝতে পারিনা, কারণ মনের মধ্যে বিষয়বুদ্ধি রয়েছে। কারণ মন সংসারে আসক্ত, নিজের দেহে মন আসক্ত, মন অপরের দেহে আসক্ত; নিজের সম্পত্তিতে মন আসক্ত, অপরের সম্পত্তিতে আসক্ত মন।

**বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না –ভগবানলাভ হয় না –বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।** বিষয়বুদ্ধি, কপটতা যা বলছেন এটাই হল ঋজু ভাবের অভাব। ঋজুভাব, আর্জব, এই শব্দগুলি থেকে ‘অর্জুন’ শব্দ এসেছে; সেখানে কোন কুটিলতা নেই, নেই কোন রকম বক্রতা, একেবারে সরল। মনে যে চিন্তা-ভাবনা চলে, যোগশাস্ত্রে এটাকে বলছেন চিত্তবৃত্তি। কারণ যদি আগ্রহ থাকে তাহলে, শুধু পাঁচ মিনিটের জন্য চূপচাপ বসে মনকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকুন আর একটু বাদে বাদে দেখুন মনে কি কি চিন্তা এসেছিল। কালীপূজায় যে তারাবাজি পোড়ান হয়, আলোর ফুলঝুড়ি হতে থাকে। মনের চিন্তা-ভাবনাগুলো তারাবাজির মত আলোর অজস্র ফুলকি ছড়িয়ে যাচ্ছে। মনের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। মন যখন ফুলঝুড়ির মত চিন্তা-ভাবনা চলে তখন স্বার্থপরতা বেড়ে যায়। মন যদি খুব চঞ্চল হয়, বুঝবেন খুব স্বার্থপর, খুব স্বার্থপর না হলে মন চঞ্চল হবে না। যারাই বলে আমার মন চঞ্চল, আসলে এরা সবাই স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক; নিজের ছাড়া কিছু বোঝে না। জপধ্যান, তপস্যা করলে এই চিত্তবৃত্তিগুলি কমতে শুরু করে। চিত্তবৃত্তি কমলে কি হয়, এই যে আত্মকেন্দ্রিক ভাব, এটা কমে যায়। আর আত্মকেন্দ্রিক ভাব যখন কমে যায়, মানুষ তখন সরল হয়।

আমাকে কেন চালাকি করতে হয়? কারণ আমি বাঁচতে চাই। মিথ্যা কথা কেন বলি? আমি বাঁচতে চাই। তুমি আমাকে ভালবাস, তোমার মনের জগতে আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমি যে অন্যায়ে করেছি, যে গোলমাল করেছি, সেগুলো যদি তুমি জেনে যাও তাহলে তোমার মন থেকে আমাকে তুমি সরিয়ে দেবে। কিন্তু আমি যে তোমার মনে স্থান পেতে চাই, তা নাহলে আমি বাঁচব না, আমাকে বেঁচে থাকার জন্য মিথ্যা কথা বলতেই হবে। চুরি যে করছে, সেও একই কারণে করছে, কারণ তাকে বাঁচতে হবে। পতঞ্জলি অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এই জিনিসগুলিকে নিয়ে বলছেন। হিংসা কেন করি? আমি বাঁচতে চাই। ঠিক তেমনি মিথ্যা কথা কেন বলছি, চুরি কেন করছি? কারণ আমি বাঁচতে চাই। ব্রহ্মচর্যে মন থাকে না, কারণ আমি বাঁচতে চাই; লোকেদের কাছ থেকে গিফটস্ নিই, কারণ আমি বাঁচতে চাই। যার কোন গিফটস্ নেওয়ার দরকার নেই সে কেন গিফটস্ নেবে, কারণ গিফটস্ নিলেই আপনাকে গিফটস্ দিতে হবে। আগামীকাল ওর সঙ্গে সম্পর্ক যখন খারাপ হয়ে যাবে, তখন ওর দেওয়া জিনিসগুলো দেখলে আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে। তার থেকে বাবা, প্রথমেই গিফটস্ না নেওয়া

ভাল। মানুষের মন কখন পাতে যাবে কোন ঠিক নেই। সেইজন্য কি দরকার লোকেদের থেকে গিফটস নেওয়া! গিফটস দেওয়া হল পরকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা। যাকে আপন মনে করি তাকেও গিফটস দিই, তখন ভুলে যাই যে আগামীকাল যদি সে পর হয়ে যায় তখন ওর দেওয়া গিফটসগুলোর কি হবে। সেইজন্য হিন্দি দোহাতে বলছেন, এইস্যা ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই। সেবা বন্দি ঔর অধীনতা সহজ মিলে রঘুরাই; এমন ভক্তি কর যাতে তোমার ভিতরের কপটতা, চতুরতার ভাব কমে যায়; আমি ঈশ্বরের দাস, এই ভাব রাখলে তুমি সহজেই ঈশ্বরকে, রঘুরাইকে লাভ করবে।

যারা বিষয়কর্ম করে –অফিসের কাজ কি ব্যবসা করে –তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত। সত্য কথা কলির তপস্যা। সত্যকে নিয়ে আগে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। অনেকে এসে প্রায়ই বলেন যে, ‘আমরা সমাজে আছি, অফিসে কাজ করছি, প্রায়ই আমাদের মিথ্যা কথা বলতে হয়, কিছু করার থাকে না। আমরা কি করব’? ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার যখন ঠিক ঠিক সময় হবে, এমন পরিস্থিতি হয়ে যাবে যে, আপনি স্বাধীন হয়ে যাবেন; তখন আর মিথ্যা কথা বলার দরকার পড়বে না। মহাভারত আদি গ্রন্থকে ধর্মশাস্ত্র বলা হয়, বিশেষ করে মহাভারতকে। সেই মহাভারতে সত্য কথাকে নিয়ে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মহাভারতে সত্য আর অহিংসার মধ্যে যেখানে বিরোধ লাগে, সেখান মহাভারত সব সময় অহিংসার পক্ষেই রায় দিচ্ছেন। ঠাকুর এখানে সাধকদের, যারা সংসারে আছে তাদেরকে নিয়ে বলছেন। ঠাকুরও জানেন, বিষয়কর্ম, অফিসের কাজ, এসব জায়গায় লোকেরা অনেক সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। সংসারে যাঁরা আছেন, মিথ্যা কথা না বলে তাঁরা থাকতে পারবেন না, তবে চেষ্টা করতে হয় যতটা সম্ভব মিথ্যা কথা না বলে থাকা যায়। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র ভারতকে বলছেন, ‘যে লোক মিথ্যা কথা বলে, আর লোকেরা যদি জানে, তখন তারা সেই মিথ্যাভাষীকে সেভাবেই ভয় পায়, যেভাবে মানুষ সাপকে ভয় পায়’। যে দোকানদার ওজনে কারচুপি করে বা দাম বেশি নিয়ে ঠকায়, দেখা যায় যে কদিনের মধ্যে লোকেদের মধ্যে দোকান সম্পর্কে ধারণা ছড়িয়ে যায় –ওই দোকানে ঠকায়।

একটা ম্যাগাজিন ছিল, ‘দি নিউজ অফ দা ওয়ার্ল্ড’, খুব নামকরা ম্যাগাজিন। এক সময় সপ্তাহে ওর দশ লক্ষের উপর কপি বিক্রি হত। বিশ্বের নামকরা লেখকরা তাঁদের লেখা ওই ম্যাগাজিনে দিতেন। আর্নেস্ট হোমিংওয়ে তাঁর বিখ্যাত বই ‘দা ওল্ড ম্যান এ্যান্ড সী’, যে উপন্যাসের জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, সেটা প্রথমে ‘দি নিউজ অফ দা ওয়ার্ল্ড’ বেরিয়েছিল। লোকেদের বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে, ২০০৮ সাল নাগাদ তাদের পাবলিকেশান অনেক কমে যায়। তাঁরা তখন এমন এমন কিছু ঘটনা ছাপাতে লাগলেন, যেগুলো মিথ্যার উপর আশ্রিত। এগুলোকে বলে স্কুপ নিউজ, বাজারে ছেড়ে দিলেন, বিক্রিও বেড়ে গেল। কিন্তু তারপরেই ওদের মধ্যে অনেক গোলমাল শুরু হল, ইনকোয়ারি লেগে গেল। ইনকোয়ারি হতে জানা গেল যে, এরা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছিল। পত্রিকার জরিমানা হয়ে গেল। লোকেদের মনেও সংশয় তৈরী হয়ে গেল, পত্রিকা প্রচার বৃদ্ধির আড়ালে এরা কি কি জিনিস করে? এক বছরের মধ্যে একশ বছরের পুরনো পত্রিকা উঠে গেল। ওদের যে শেষ সম্পাদকীয় তাতে পত্রিকার সম্পাদক খুব দুঃখ করে লিখছেন –এত বছরের পুরনো পত্রিকা উঠে যাচ্ছে, যে পত্রিকাকে আমরা সব সময় একটা উচ্চমানে তুলে রেখেছিলাম, কিন্তু কোথাও আমরা একটা জায়গায় ভুল পা ফেলেছিলাম। কর্পূর পুড়ে গেলে যেমন কোন ছাই থাকে না, ঠিক তেমনি ‘দি ওয়ার্ল্ড অফ নিউজের’ নাম আজ কেউ জানেও না।

সাধন পথে কেউ যখন এগোতে শুরু করেন, তখন সত্যকে ধরে রাখতে হয়, আর ভুল কাজ করলে যার সঙ্গে ভুল কাজ করা হয়েছে হাতজোড় করে তাকে বলতে হয় আমি ভুল কাজ করে ফেলেছি। তিনি যদি ক্ষমা করে দেন ভাল, আর তিনি যদি ক্ষমা না করেন তখন ওটা মেনে নিতে হয় যে, এটাই আমার প্রায়শ্চিত্ত। কত দিনের প্রায়শ্চিত্ত হবে? সারা জীবন প্রায়শ্চিত্ত যদি করতে হয়? কত দিন আর এই জীবনে বাঁচবেন, কুড়ি বছর কি তিরিশ বছর। ঠিক আছে, জেলের যেমন মেয়াদ হয়,

তেমনি এটাও আমার মেয়াদ। যাকে ভালবাসতেন, সে আপনাকে বলে দিল ‘আমি কোন দিন তোমাকে আর বিশ্বাস করব না’। ‘ঠিক আছে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি তো সত্য কথাই বলেছি, মিথ্যাও তো তোমাকে বলতে পারতাম’। পাঁচজন লোক আপনাকে ছেড়ে দিতে পারে, পাঁচটা টাকা আপনার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আপনি অনেক উঁচুতে চলে যাবেন, সাধন-ভজনে এগিয়ে যাবেন। সত্যে টিকে থাকা খুব কঠিন, সহজ কিছু না। কিন্তু আমাদের এটাই করতে হয়, ঠাকুর এটাই করতে বলেছেন। এই কথা শুধু ঠাকুরের কথা না, সব জায়গায় এই কথাই বলা হয়।

মহাভারত আদিতো বলছেন –বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু যাঁরা সাধনার পথে নেমে পড়ছেন, তা তিনি অফিসেই থাকুন আর বাড়িতেই থাকুন, আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে মিথ্যা কথা না বলতে হয়। ধীরে ধীরে দেখবেন, জীবনে এমন পরিস্থিতি আসবে না, যেখানে আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে। সত্য কথা কলির তপস্যা।

প্রাণকৃষ্ণ তখন মহানির্বাণতন্ত্র থেকে একটা শ্লোক বলছেন –*অস্মিন্ ধর্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ* ইত্যাদি। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –

**শ্রীরামকৃষ্ণ** –হাঁ, **ওইগুলি ধারণা করতে হয়**। আমাদেরও কথামৃত বা যে কোন গ্রন্থ শুধু পড়লাম, মুখস্ত করলাম, কেবল তা করলে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে ধারণাটাও করতে হয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যশোদার ভাব ও সমাধি

ঠাকুর ছোট খাটটির উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ঘরে রাখাল আছেন। রাখালকে দেখে ঠাকুরের বাৎসল্য ভাব হয়েছে। রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্য রসে আপ্ত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধি হইলেন। ঘরের মধ্যস্থ ভক্তেরা অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শন করিতেছেন।

কিষ্কিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়? যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বরের ভাগ কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা ঈশ্বরী মূর্তি। সে-মূর্তিতে ঐশ্বরের বেশি প্রকাশ। তারপর দর্শন দ্বিভুজা –তখন দশ হাত নাই –অত অস্ত্রশস্ত্র নাই। তারপর গোপাল-মূর্তি –কোন ঐশ্বর্য নাই –কেবল কচি ছেলের মূর্তি। এরও পারে আছে – কেবল জ্যোতিঃ দর্শন।

যাঁর ইষ্ট মা দুর্গা, সাধনা করে দেবীর যখন দর্শন হয়, এটা বাস্তবিক দর্শন, কল্পনা নয়; ঈশ্বর যখন দেবী রূপে সামনে আসেন, তখন তিনি কি দেখছেন? প্রথমে দশভুজা, তারপর দ্বিভুজা আর শেষে গোপাল মূর্তি, ঐশ্বর্য কমে যাচ্ছে। এই যে বাৎসল্য ভাব, এই ভাব একমাত্র হিন্দু ধর্মেই আছে। কিছু কিছু খ্রীশ্চান আছেন, যাঁরা যীশুকে ছোট শিশু রূপে ভজনা করেন –*Christ as baby*। এটুকু ছাড়া, এমনকি বৌদ্ধ ধর্ম, যেটা খুব নরম ধর্ম, যেখানে ভগবান বুদ্ধকে শিশু রূপে পূজা করা হয়, অন্য কোন ধর্মে বাৎসল্য ভাব নেই। মায়েদের ভিতর বাৎসল্যের ভাব বেশি হয়। শুধু নারীই না, একজন পুরুষের মধ্যেও বাৎসল্য ভাব পাওয়া যাবে। সে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখতে চায় না। একজন মা, তার যত বয়সই হয়ে যাক, সন্তানকে সে সব সময় ছোট বাচ্চার মতই দেখে। মা জানে তার আলাদা ব্যক্তিত্ব, কিন্তু দেখে শিশুর মতই। ঈশ্বরকে শিশু রূপে দেখার প্রকৃষ্ট নমুনা হল –রামলালা, বালগোপাল, নাড়ুগোপাল। ইদানিং কালে শিবকে বাচ্চা ছেলে হয়ে শুয়ে আছেন দেখা যায়। এটাও এখন প্রচলিত হয়েছে। যদিও আমাদের সাধনাতে শিবকে ছোট শিশু রূপ সাধনা করা নেই। কিন্তু রামলালার ভাবটা আগেও ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের গাথা তো এখন আমাদের একটা আলাদা সাহিত্য হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ সাধনার পরম্পরায় সুরদাস খুব নামকরা সাধক ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণে বাল্যলীলা কাহিনীকে অমর করে দিলেন। আমরা অনেক সময় এগুলোকে কবির কল্পনা রূপে দেখি, কবি খুব সুন্দর রচনা করেছেন বলি। কিন্তু কৃষ্ণ সাধকরা এই রূপ বাস্তব দেখেন।

আমি একটা ঘটনা শুনেছিলাম। কম বয়সে এগুলো শুনতে ভাল লাগত, অবাগত লাগত। বেলুড় মঠে একটা ব্যাপারে মঠের বড়রা সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিলেন, কিন্তু অনেকের এই ব্যাপারটা মনঃপূত ছিল না। একজনকে বলা হল, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে এই কথা বলে আসতে। আমরা তো বেলুড় মঠের ঠাকুরের বিগ্রহকে সাক্ষাৎ দেখি, তিনি জীবন্ত। উনি গেলেন, যাওয়ার পর ছুটে বেরিয়ে চলে এলেন। কি ব্যাপার? বলছেন, ‘ঠাকুর এমন তেড়ে রয়েছেন যে, কিছু বলার সাহস হল না’। বেলুড় মঠে সেই বিগ্রহ, আপনারা বেলুড় মঠে তাঁকে প্রণাম করতে আসছেন, আপনার বাড়িতে যে দেবতার বিগ্রহ আছে, দুটো একই জিনিস, একই ভাব। আমি অনেক মহারাজদের কাছে শুনেছি—ওনারা যখন ঠাকুরের কাছে যান, দেখেন ঠাকুর বিভিন্ন দিন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আছেন। এখন ঠাকুর বিভিন্ন ভাবে থাকেন, নাকি ওনার ওটা মনের বিভিন্ন অবস্থা, বলা মুশকিল। ঠাকুর এখানে দশভুজা, দ্বিভুজা, নাড়ু গোপালকে নিয়ে বলছেন।

গোপাল মূর্তির পর জ্যোতিঃ দর্শন। যাঁরা ধ্যান-ধারণা করেন, যাঁদের সিদ্ধি আদি হয়েছে, তাঁদের ইষ্টের রূপ জীবন্ত না হওয়া পর্যন্ত আসল সাধনা শুরু হয় না। মনে করা যাক মা কালী আপনার ইষ্ট। ধ্যান করতে করতে, মা কালীর সেই রূপ, যে রূপের এতক্ষণ কল্পনা করা হচ্ছিল, সেই রূপটা জীবন্ত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না ইষ্টের রূপ জীবন্ত হয়ে ওঠে, ততক্ষণ ঠিক ঠিক সাধনা শুরু হয় না। জীবন্ত হয়ে ওঠার পর দেখা যায়, তিনি জ্যোতিঃ সমুদ্রে আছেন। সেই জ্যোতিঃ সমুদরের মধ্য মা কালি বা যিনি আপনার ইষ্ট, সেই রূপ জ্বলজ্বল করছে। জ্যোতিঃ দর্শন চব্বিশ ঘন্টা থাকে। আপনি ধ্যান-ধারণা করছেন, শুধু তখনই দেখা যাবে আর বাকি সময় দেখা যাবে না, এটা তা না, চব্বিশ ঘন্টা দর্শন হয়। চব্বিশ ঘন্টা ওই রূপের যে দর্শন হচ্ছে, এটাই হল প্রমাণ যে, আপনি সাধন-ভজনে অনেক উপরে চলে গেছেন। অনেকের আবার জ্যোতিঃ দর্শন আগে হয়ে যায় আর পরে ইষ্টরূপের জীবন্ত দর্শন হয়, দুটোই হয়। জ্যোতির আলোটা চৈতন্য আলো। সেই চৈতন্য আলোর জ্যোতিঃপুঞ্জ যেটা, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে যিনি ইষ্ট, তিনি ওটাকে যেন আলোকিত করে রেখেছেন। তিনিই সেখানে জ্যোতির জ্যোতি হয়ে রয়েছেন। যখন জ্যোতিঃ দর্শন হয়, তখন সেই জায়গা থেকে ঠিক ঠিক সাধনা শুরু হয়।

আমরা ১লা জানুয়ারী ১৮৮৩ সালের আলোচনাতেই আছি। প্রাণকৃষ্ণ এই দিনের মূল ব্যক্তি। এর আগে বলা হয়েছিল প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞানবিচার করেন। আমরা আগেও বলেছি যে, জ্ঞানবিচারের সাধনা নেতি নেতি। নেতি নেতি সাধনা একমাত্র বেদান্তেই আছে, বেদান্ত ছাড়া আর কোথাও এই সাধনা নেই। বেদান্তে দুটি পথের কথা বলা হয়—জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। যাঁরা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন, একমাত্র তাঁরাই নেতি নেতি সাধনা করেন। নেতি নেতি করা অত্যন্ত কঠিন জিনিস। যাঁরা গৃহস্থ, সংসারে আছেন, বিশেষ করে যাদের দেহের প্রতি এতটুকু আসক্তি আছে, তাদের পক্ষে নেতি নেতি সাধনা একেবারেই সম্ভব না। ঠাকুর করুণাসাগর, ভক্তদের সাথে যখন কথা বলছেন, তখন তাঁদের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার সব কিছু আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। যার ফলে কথামূতের এই কথাগুলো যাঁরা সংসারে আছেন, যাঁরা গৃহস্থ, তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে যে সন্ন্যাসীদের জন্য সহজ হবে, তা নয়, সন্ন্যাসীদের জন্যও কঠিন। যাঁরা খুব গভীরে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা করছেন, যাঁরা খুব উচ্চমানের সাধক, তাঁদের জন্য এই কথাগুলো। যাঁরা সিদ্ধপুরুষ তাঁরা যদি একটু অধ্যয়নে মন দিতে চান, তাঁরা এই গ্রন্থকেই অবলম্বন করবেন। যিনি হিমালয়ে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ঘুরে এসেছেন, তিনি জেনে গেছেন হিমালয় কেমন, গঙ্গোত্রী কেমন, কেদারনাথ কেমন। হিমালয় ভ্রমণের উপর কোন বই পেলে তিনি বলবেন, আমার জানা আছে, আমি নিজেই ঘুরে এসেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও

বইটা উল্টেপাল্টে তাঁর দেখতে ইচ্ছে হয়—দেখি কেমন বর্ণনা আছে, পড়লে আমারও একটা স্মৃতিরোমস্থল হয়ে যাবে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সিদ্ধপুরুষদের কাছে কথামৃত অমূল্য গ্রন্থ। শুধু সিদ্ধ পুরুষদের জন্যই না, সবারই জন্য, যুবক, প্রৌঢ়, গৃহবধু, সন্ন্যাসী সকলের জন্যই কথামৃত এক অমূল্য গ্রন্থ, কথামৃত থেকে সবাই বিশেষ লাভবান হন।

এখানে জ্ঞানবিচার বা নেতি নেতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঠাকুর প্রথমে বলছেন—**তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধি হলে—জ্ঞানবিচার আর থাকে না।** ঈশ্বরকে দুই প্রকারে জানা হয়—একটা হল মনের মাধ্যমে, দ্বিতীয়টা হল মনের বাইরে। আমরা এর উপর অনেকবার আলোচনা করেছি। তবে এটা খুব কঠিন জিনিস কিনা, তাই বারবার আলোচনা করতে হয়। যাঁরা এই জিনিসগুলোকে মনে গেঁথে নিয়েছেন, তাঁদের কাছে পুনোরক্তি বলে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। একই ভাবে পরিবেশন করা ঈশ্বরীয় কথা শুনলে ক্ষতি তো কিছু নেই, ঈশ্বরীয় কথারই রোমস্থল হবে, ঈশ্বরের দিকেই মনটা যাবে।

আমরা যদি যোগশাস্ত্র দিয়ে এই জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে আরও সহজে বোঝা যাবে। রাজযোগকে বলা হয় science and technic of spirituality। যোগশাস্ত্র খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন—মনের ভিতরে যতক্ষণ একটিও চিন্তা-ভাবনা থাকে, তা সে যে চিন্তা-ভাবনাই হোক; ততক্ষণ পূর্ণজ্ঞান হয় না। মনকে চিন্তাশূন্য করার জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করা হয়। জ্ঞানপথের সাধক বলেন, আমি ওখানে পৌঁছাতে চাই, আমি ঈশ্বরকে জানতে চাই, আমি আত্মজ্ঞান পেতে চাই। তাঁর সামনে যে যে বাধাগুলি রয়েছে, সে বলবে, আমি সব কটা বাধাকে সরিয়ে দেব। এই বাধাগুলিকে উপাধি বলা হয়।

যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, আপনারা বেশির ভাগই সংসারে আছেন। সংসারীদের কাছে এত সময় নেই যে, এগুলোকে নিয়ে তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করবেন বা এর মধ্যেই ডুবে থাকবেন। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কাছে অটেল সময়, আমরা তাই এগুলো নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা-ভাবনা করি। আমরাও মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়ে যাই, এ কি মায়া! ঈশ্বর অনন্ত, যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি কি একটা ইচ্ছা করলেন যে, যিনি এক, তাঁকে বহুরূপে দেখছি। সাংখ্যদর্শনে যেটা বলা হয়েছে, যোগদর্শন যেটা গ্রহণ করেছে—তিনিই প্রকৃতি রূপে দেখাচ্ছেন, তিনিই মহৎ অর্থাৎ বিশ্বমন রূপে দেখাচ্ছেন, তিনিই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব রূপে দেখাচ্ছেন। শুধু দেখাচ্ছেন না, তিনি সব কিছুর মধ্যে ঢুকে আছেন। আমি আপনাদের সামনে বসে আছি বা আপনারা আমার সামনে বসে আছেন, সবটাই কেমন যেন একটা চিঞ্জড়গ্রন্থি, যার মধ্যে এই চব্বিশটি তত্ত্ব জড়িয়ে আছে, তার ভিতরে সেই তিনিই। তিনিই এই চব্বিশ তত্ত্ব হয়েছেন, তিনিই এই দেহ হয়েছেন, তিনিই এই মন হয়েছে আর তিনিই এর ভিতরে জীবাত্তা হয়ে, অন্তর্যামী হয়ে ঢুকে আছেন। আর তিনিই কিনা সেই অনন্ত—কী আশ্চর্য! টাকা খরচ করে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে পি সি সরকারের জাদু দেখতে যাই, কিন্তু এখানে যে কত বড় জাদু চলছে, কত কত ভেঙ্কি লেগে আছে, আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

এখন কোন সাধক যদি চান, আমার এই ভেঙ্কি লাগবে না; তখন তিনি নেতি নেতি এই বিচার করে সব ত্যাগ করতে শুরু করলেন। ঠাকুর বলছেন, ‘যখন তাঁকে লাভ হয়’; লাভ জিনিসটাকে যোগশাস্ত্রে খুব সুন্দর বলছেন—*তদাদ্রষ্ট্ব স্বরূপে অবস্থানম্*। যিনি সাধনা করছেন, তিনি যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন বলছেন, সাধকের সমাধি হয়। সমাধির অর্থ হয়, সমাহিত করা; পুরো জিনিসটাকে গুছিয়ে ঢুকিয়ে এক জায়গায় দিয়ে দেওয়া। ঠাকুর বলছেন, ‘তখন জ্ঞানবিচার আর থাকে না’; কিসে আর জ্ঞানবিচার থাকবে, কারণ মনই তো নেই। যতক্ষণ চিন্তা-ভাবনা ততক্ষণ মন। চিন্তা-ভাবনা যদি থেমে যায়, সেটাকে আর মন বলা যাবে না। যীশু খুব সুন্দর বলছেন—*লবণের লবণত্ব যদি চলে যায়, সেটা একটা মাটির ডেলা, আর লবণ কেন বলব! ঠিক তেমনি মনের যদি চিন্তাই না থাকে, তাহলে আর সেটা কিসের মন।*

**জ্ঞানবিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়** –আমি দেখছি, আমি আলাদা, এই মাইক্রোফোন আলাদা; এই পেন আলাদা, টেবিল আলাদা; কারণ আমার মধ্যে বহু বোধ আছে কিনা; বহু বোধ থাকা মানেই জ্ঞানবিচার করে করে আমাকে একত্ব বোধের দিকে যেতে হবে। যখন মনে হয় তিনিই আছেন, ঈশ্বর এক, তখনও কিন্তু জ্ঞানবিচার আছে, অর্থাৎ মন তখনও আছে। তবে এটা অনেক উচ্চ অবস্থা। যতক্ষণ বহু জ্ঞান ততক্ষণ জ্ঞানবিচার চলবে। আর শেষ ধাপে আমি আছি আর ঈশ্বর আছেন; আমি একজন, ঈশ্বর আর-একজন, তখনও জ্ঞানবিচার চলে। তোতাপুরি ঠাকুরকে এটাই করিয়েছিলেন। এই কথাগুলো আপনারা যাঁরা শুনছেন, মনে হবে খুব কঠিন জিনিস, ঠিকই কঠিন মনে হবে, উচ্চতত্ত্ব কিনা। ঠাকুরই বলছেন –এগুলো শুনে রাখতে হয়, সময় হলে হয়। আর তাছাড়া যিনি অবতার, যিনি কদিন আগেও ছিলেন, এখনও তাঁর সব কিছুর স্মৃতি জ্বলজ্বল হয়ে আছে, সেইজন্য তাঁর কথা তো আমাদের জেনে রাখা বা শুনে রাখা খুবই দরকার।

**যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি –এ-সব বোধ থাকে। ‘আমি-তুমি’** এখানে ঠাকুর মানুষকে নিয়ে বলছেন, কিন্তু এটা শেষ অবস্থাতেও হবে, যেখানে ঈশ্বর ও ভক্ত, সেটাও। ওটা হল একটা ধাপ, ওই ধাপ যতক্ষণ না পেরোন হয় ততক্ষণ শেষ অবস্থায় যাওয়া যায় না। এই একত্বের উপলক্ষি ঠাকুর নিজেই বর্ণনা করছেন –দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যে বলির কাঠ, যে খড়া, যে বলি দেবে, যে ছাগকে বলি দেওয়া হয়, সব কিছুকে এক দেখছেন। শুধু যে সমাধি অবস্থাতেই যে এক দেখবেন তা না, বাস্তবেও এক দেখেন।

**যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়।** কাকে নিয়ে বলবেন, আর কি নিয়েই বা বলবেন। এক জ্ঞান যখন হয়ে গেল, যখন বুঝছেন যাঁর সঙ্গে কথা বলি ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি সেই সচ্চিদানন্দ, এরপর তাঁকে নিয়ে তিনি কি আর কথা বলবেন। রাজা মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে ওনার এক শিষ্য বলছেন, ‘মহারাজ, আপনি তো আমাদের কোন উপদেশ দেন না’। মহারাজ শিষ্যকে বলছেন ‘কি করব বল, যখনই উপদেশ দিতে যাই তখন দেখি যাকে উপদেশ দিচ্ছি সে সাক্ষাৎ নারায়ণ, তখন কাকে উপদেশ দেব’।

এক জ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়; ঠাকুর বলছেন, **যেমন ত্রৈলোক্য স্বামী**। ঠাকুরের সময় ত্রৈলোক্য স্বামী ছিলেন, তিনিও কারুর সাথে কথা বলতেন না। পরে আবার ঠাকুর বলবেন, অনেক সময় জ্ঞানবিচারের পর, তিনি কাউকে কাউকে লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। ঠাকুরের উপমাগুলো এত সুন্দর যে, মানুষ তত্ত্বটাকে মনে রাখে না, কিন্তু কাহিনীটা মনে রাখেন। কাহিনীগুলো মনে রাখতে পারলেও ভাল। আমাদের রামায়ণ মহাভারতে এটাই করা হয়েছিল। সমুদ্রকে সাঁতরে পেরিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ পারবে না। সমুদ্র পার করার জন্য সাধারণ মানুষদের অনেক কিছু লাগে, যেমন বড় জাহাজ চাই, জাহাজে আবার অনেক কিছুর আয়োজন রাখতে হয়, যাতে নির্বিঘ্নে সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়া যায়। যদি সাবমেরিন নিয়ে যান, তাহলে আপনাকে আরও অনেক উন্নতমানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সাধারণ মানুষ, সাঁতরে সমুদ্র পার করতে পারব না, সেইজন্য অনেক কিছুর আয়োজন করতে হয়। এই যে পৌরাণিক কাহিনী, বা ঠাকুরের উপমাগুলো, এগুলো আমাদের সাহায্য করে তত্ত্বটা বোঝার জন্য।

আগেকার দিনে ছিল, শহরের দিকে কমে গেছে, গ্রামে এখনও কিছু কিছু দেখা যায়, কোন উৎসব হলে, বিশেষ করে শ্রাদ্ধাদি হলে ব্রাহ্মণদের আলাদা করে ডেকে ভোজন করানো হত। ব্রাহ্মণ ভোজনের উপমা দিয়ে ঠাকুর সমাধির বর্ণনা করছেন।

**ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখ নাই? প্রথমটা খুব হইচই। পেট যত ভরে আসছে ততই হইচই** কমে যাচ্ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়ল তখন কেবল সুপ-সাপ! আর কোনও শব্দ নাই। তারপরই নিদ্রা – সমাধি। তখন হইচই আর আদৌ নাই। ইদানিং কালে পার্টি আদিতো যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা

হয়, সেখানে এই দৃশ্য পাওয়া যাবে না। এখন তো বুফে নামের এক বিচিত্র সিস্টেমে আমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করা হয়। একজন মজা করে লিখেছেন—আগেকার দিনে আমরা খাওয়ার টেবিলে বসে থাকতাম, নিমন্ত্রণ কর্তা নিজে বা তাঁর বাড়ির লোকেরা সবার টেবিলের সামনে গিয়ে খোঁজ নিতেন—ঠিক ভাবে খাচ্ছেন তো, কোন অসুবিধা হয়নি তো, বা বলতেন এই আইটেমটা আপনি আর-একটু নিন, আর-একটু ফ্রাইড রাইস নিন, আর-এক টুকরো মাংস নিন, আর-একটা রসগোল্লা নিন। ‘আর-একটু নিন’ ‘আর-একটু নিন’ এই আপ্যায়ন ধ্বনিটা খুব আপন আপন লাগত, খুব মিষ্টি মনে হত। কিন্তু ইদানিং বুফে সিস্টেম হয়ে গেছে। আমরা বিশেষ অতিথিরা প্লেট হাতে করে গিয়ে বলি, ‘আর-একটু দিন’, ‘আর-একটু দিন’। ভিআইপি থেকে আমরা এখন হয়ে গেলাম কাঙালি, কাঙালির মত হাতে একটা প্লেট নিয়ে বলছি ‘আর-একটু দিন’। ঠাকুর বুফে সিস্টেম দেখেননি, দেখলে এখানে আর এই উপমা দিতেন না।

কথামতের অন্য জায়গায় ঠাকুর আবার অন্য ভাবে বলছেন, ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রথমে খুব হইচই, এই ভাত দাও, ডাল দাও, লুচি দাও। যখন দধি মুণ্ডি পড়ল তখন সুপ-সাপ। এখন আর সুপ-সাপ আওয়াজ হবে না, সবাই এখন পাতলা প্লাইউডের চাপচ দিয়ে দই খাই। আগেকার দিনে হাত দিয়ে দই খেতে বলে সুপ-সাপ আওয়াজ হত। খাওয়ার পর আর কোন শব্দ নেই, তারপরেই নিদ্রা, অর্থাৎ সমাধি; আর কোন হইচই নেই, সব নিস্তব্ধ। ঠাকুর এটা একটা উপমা দিয়ে বোঝাতে চাইছেন জ্ঞানবিচার করতে করতে কি হয়, দেখাচ্ছেন জ্ঞানবিচারে ব্রাহ্মণ ভোজনের মত অনেক কিছু হয়।

**(মাষ্টার ও প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) – অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়।** তখন ব্রাহ্মসমাজ ছিল, ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের লোকেদের জানতেন ওনারা কেমন বড় বড় কথা বলতে অভ্যস্ত। ইদানিং কালে দেখা যায়, অনেকে আছেন যাঁরা অদ্বৈত জ্ঞানের নিচে কোন কথাই বলবেন না। একটা কিছু কথা বলে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে শুনিয়ে দেবেন, অমুক উপনিষদে এই বলেছে, মুণ্ডকোপনিষদে এই বলেছে। উপনিষদের কথা শোনার প্রস্তুতি আছে? আগে উপনিষদ পড়ার যোগ্যতা অর্জন করুন। অনেক সময় বলে, ওটাই যদি তত্ত্ব হয়, তাহলে এগুলো শোনা কেন? ভাই মৃত্যুই যদি সত্য হয় তাহলে বেঁচে থাকা কেন, গলায় দড়ি দিয়ে দিলেই হয়। বোঝার ক্ষমতা নেই কিনা, তাই উল্টোপাল্টা তর্ক করবে।

কিন্তু নিচের জিনিস লয়ে থাকে। ষড়বাড়ি, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। মনুমেন্টের নিচে যতক্ষণ থাক ততক্ষণ গাড়ি, ঘোড়া, সাহেব, মেম—এইসব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র ধু-ধু কচ্ছে! তখন বাড়ি, ঘোড়া, গাড়ি-মানুষ এ-সব আর ভাল লাগে না; এ-সব পিঁপড়ের মত দেখায়। উপরে উঠে নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় যে সব মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। আমরা নিচে আছি, নিচে থাকা মানে মনের স্তরে অবস্থান করে আছি, মনের স্তরে থাকলে এই সংসার, যেখানে আমি-তুমি বোধ, বড়-ছোট বোধ। সবচেয়ে বড় সমস্যা মনের স্তরে চাওয়া-পাওয়া লেগে থাকে। ফলে কি হয়, ব্রহ্মজ্ঞান এটাও একটা বিষয়। একবার ভুবনেশ্বরে একটা বেদান্ত সেমিনারে আমাকে ডাকা হয়েছিল। রাস্থা দিয়ে গাড়ি করে যাওয়ার সময় ওই সংস্থার দর্শনের একজন প্রফেসার বেদান্ত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন ভাবে কথা বলছিলেন যে, শুনে মনে হবে বেদান্ত যেন একটা চিন্তা-ভাবনার জিনিস। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আটকলাম—বেদান্ত সত্য; বেদান্ত একটা চিন্তা-ভাবনার বিষয়, এই ভুলটা কক্ষণ করবেন না।

পাশ্চাত্য দর্শন আর হিন্দু দর্শনে একটা বিরাট বড় পার্থক্য হল, পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁরা মন দিয়ে, যুক্তি দিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছাতে চেষ্টা করেন, অন্য দিকে হিন্দুদের ষড়দর্শন বেদের সত্যটাকে মনে নিয়ে তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। বেদান্ত কোন থিয়োরি না, বেদান্ত একটা সত্য। কান্ট, হেগেল এনাদের কাছে এগুলো থিয়োরি হতে পারে—theory of this, theory of that। এমনকি বৌদ্ধ ধর্মের যে ফিলজফিগুলি আছে, সেগুলোও থিয়োরি। কিন্তু বেদান্ত কোন থিয়োরি না। অধ্যাপক বেদান্তকে একটা থিয়োরি মনে করে আলোচনা করতে চাইছিলেন। আমি ওনাকে বললাম, ‘বেদান্তকে কখন



থিয়োরি বলবেন না, আপনি এত বড় অধ্যাপক হয়ে এই মারাত্মক ভুলটা করবেন না’। আপনি বলবেন, আমি বেদান্তী নই। আপনি তাহলে বেদান্ত পড়াবেন না। হিন্দু ধর্মের নিন্দুকরা এই ভাষা ব্যবহার করে, আপনি তো তা নন, আপনি একজন হিন্দু, আপনি হিন্দু ধর্মকে মানেন।

একজনকে আমি জানতাম, তিনি একদিকে পূজারী আবার অন্য দিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য। আমি হেসে ওনাকে বললাম, ‘আপনি কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বার আবার পূজারীর কাজ করেন’। ‘এটা তো আমার কাজ’। ‘কি বলছেন? পূজাটাকে আপনি একটা কাজ মনে করছেন? পূজাকে একটা কাজ মনে করার মানেই হল, পূজাতে আপনার কোন নিষ্ঠা নেই, শ্রদ্ধা, ভক্তি নেই। আপনি পূজা করছেন, কিন্তু আপনার মন-মুখ এক না। আপনার কি হবে ভাবছেন, আর আপনার যে যজমান তাদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন?’ এভাবে কি কোন কিছু হয়? একদিকে আপনি বলবেন, ধর্ম আফিং অন্য দিকে পূজাটা হল আপনার পেট চালানোর জন্য। ঠাকুর ঠিক এই কথাই বলছেন—ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলে কিন্তু মন রয়েছে ঘরবাড়ি, টাকা, মান, ইন্ড্রিয়সুখে।

নূতন একটা শব্দ এসেছে—পপ স্পিরিচুয়াল। চব্বিশ পাঁচশ বছরের ছেলেমেয়েরা এখন শিখিয়ে যাচ্ছে; কোন সাধনা নেই, তপস্যা নেই পূজাপাঠ শিখিয়ে যাচ্ছে। এক সময় আমি নরেন্দ্রপুরে অনেক দিন ছিলাম। অন্য কোন এক মতাদর্শের একজন মহিলা এসেছে আমাদের ছেলেদের গীতার ক্লাশ নিতে। আমি মহারাজদের বললাম, ‘মহারাজ আমাদের কি এতই দুরবস্থা হয়ে গেল’? উনি বললেন, ‘না একটা ব্যাপার আছে, যেটার জন্য ওনাকে আনা হয়েছে’। ছাব্বিশ বছরের মেয়ে, কোথায় একটা গীতার কোর্স করে আমাদের সামনে ছেলেদের গীতা শেখাতে এসেছে।

**ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারাসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে উৎসাহ**—সব চলে যায়। যাঁরা নিয়মিত কথামৃত পড়েন, বা যাঁদের কাছে কথামৃত আছে, তাঁদের জন্য ‘উৎসাহ চলে যায়’ এই কথাটা খুব সুন্দর কথা। ‘উৎসাহ চলে যায়’ এই শব্দটা ঠাকুর কোথা থেকে বলছেন বলা খুব মুশকিল; কারণ এই শব্দ আমাদের শাস্ত্রে অনেক জায়গায় পাওয়া যাবে। নারদ-ভক্তিসূত্র ঠাকুরের খুব প্রিয় গ্রন্থ ছিল, সেখানেও আমরা এই শব্দটা পাই। সেখানে বলছেন, *ন রমতে নোৎসাহী ভবতি*, সংসারের বিষয়ে রমণ করেন না, আর সেই ব্যাপারে কোন উৎসাহও থাকে না। এখানে পরে পরে ঠাকুর বলবেন, অন্যান্য জায়গাতেও ঠাকুর বলছেন—সংসারে যাঁরা আছেন তাঁদের বিভিন্ন জিনিস করতে হয়। একটা কিছু হয়ে গেছে, মনে করুন একজনের অত্যন্ত প্রিয় কেউ হঠাৎ মারা গেলেন। ইতিমধ্যে তার বাড়িতে তার ছেলে বা মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান আছে, বিরাট আয়োজন হয়ে গেছে। কিন্তু সে এখন কাউকে ঘটনাটা বলতে পারছেন না, সেই মুহুর্তে সে কি করবে? বিয়ের উৎসব নিয়ে তার সব উৎসাহ চলে গেছে। তার এই নিরুৎসাহ ভাবে দেখে অনেক হয়ত ধরে ফেলতে পারবে, অনেকে পারবে না। ঠোঁটের পাশে একটা নকল হাসি লাগিয়ে হাঁ ছ করে সব কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক এখন তাঁর কর্তব্য করছেন, তাঁকে এটাই করতে হবে। কিন্তু এত বড় যে অঘটন ঘটে গেছে, যার জন্য এই বিরাট উৎসব আয়োজনে তাঁর সব উৎসাহ শেষ হয়ে গেছে। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে নেমে আছেন, আর যাঁরা সত্যি সত্যি এই জীবনে নেমে গেছেন, তাঁদের—রমণ আর উৎসাহ এই দুটো চলে যায়। জগতের ব্যাপারে উৎসাহের লেশ মাত্র নেই, আধ্যাত্মিক জীবনে আপনি এগোচ্ছেন কিনা এটাই হল লক্ষণ।

এটাও অনেক সময় ফ্রডগিরিতে নেমে যায়। ফ্রডগিরি এই অর্থ যে, অনেকে আছেন যাঁরা ধর্ম নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেন, অন্য দিকে টাকা-পয়সা সম্পত্তি প্রচুর, কিন্তু বলবে আমি এগুলো থেকে অনাসক্ত। কিন্তু সব কিছুর হিসাব রাখবে, একটা পয়সা এদিক ওদিক হয়ে গেলে কাউকে ছাড়বে না। এক সময় আমি কানপুরে ছিলাম, সেখানকার একজন নামকরা বাবাজীকে আমি জানতাম, ওর অনেক গল্প শুনেছিলাম। একবার কোন এক জায়গায় এক সপ্তাহের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে, সেখানে উনি প্রবচন দেবেন, তার জন্য ওনাকে দশ লক্ষ টাকা দিতে হবে। যাওয়ার পর প্রথমেই ওনাকে দু লাখ

টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংগঠকদের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হল, ‘বাকি টাকাটা আমাদের এখনও জোগাড় হয়নি, ব্যবস্থা হলেই আমরা সব মিটিয়ে দেব’। উনি বলে দিলেন, ‘দশ লাখ একবারে না দিলে আমি প্রবচন দেব না’। ওনারা বললেন, ‘আমরা অরগানাইজ করছি বলেই আপনি টাকা পাচ্ছেন’। বিশ্বাস করবেন, উনি তিন দিনের প্রোগ্রাম বাতিল করে চলে গেলেন।

এটাই লক্ষণ, আমি উৎসাহী। হয়ত দেখাবে, টাকা তো আমার কাছে নেই, ওটার জন্য ট্রাস্টি আছে, কিন্তু আপনি উৎসাহী। কিভাবে টাকা আয় করা যাবে, এই ব্যাপারে আপনি উৎসাহী। কামিনী-কাঞ্চনে আপনি উৎসাহী। তার মানে আপনি নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলতে পারবেন না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানী হলে এই উৎসাহ বোধ চলে যাবে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে এটাই বলছেন, যখন ধীরে ধীরে ভক্তি বাড়ে তখন রমণ, এটাতেও থাকবেন না। আর কোন কারণে যদি সংসারে থাকতে হয়, সংসারের কোন কিছুতে উৎসাহ থাকবে না। এটাই ঠাকুর বলছেন—বহির্ত্যাগ ও অন্তরত্যাগ। যাঁরা সংসারে আছেন তাঁরা বহির্ত্যাগ করতে পারেন না, কি করে করবেন; তাঁর সংসার আছে। কিন্তু ভিতর থেকে ত্যাগ হয়, তার মানে উৎসাহটা থাকবে না। সংসারের কোন কিছুর ব্যাপারে যদি উৎসাহ থাকে, বুঝবেন এখনও অনেক দেবী আছে, অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশ করতেই এখনও অনেক সময় লাগবে।

সব শান্তি হয়ে যায়। উৎসাহ চলে যাওয়া মানেই সব শান্তি হয়ে গেল। আমাদের জীবনে যে এত অশান্তি, সব অশান্তির মূলে উৎসাহ। কাঠ পোড়বার সময় অনেক পড়পড় শব্দ আর আগুনের ঝাঁঝ। সব শেষ হয়ে গেলে, ছাই পড়ল—তখন আর শব্দ থাকে না। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়—শেষে শান্তি। একই কথা বলছেন। আপনার একটা জিনিসে কেন উৎসাহ? কারণ ওই জিনিসে আপনার আসক্তি আছে। যখন পরনিন্দা পরচর্চা হয় তখন মানুষ জেগে ওঠে, কারণ তাকে আমি পছন্দ করি না, তার প্রতি আমার বিদ্বেষ আছে, ফলে যখন লোকটির নিন্দা হচ্ছে তখন সে উৎসাহ পায়। অসুস্থ মানুষ পর্যন্ত পরনিন্দাতে এত উৎসাহ পায় যে, সে অসুস্থতা থেকে চনমন করে জেগে ওঠে। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়, আর উৎসাহ যদি যায় তার মানে আসক্তি চলে গেছে। আসক্তি আর উৎসাহ চলে গেলে শেষে আসে শান্তি।

ঈশ্বরের যত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। আপনার জীবনে কি শান্তি এসেছে? এখানে শান্তি এসেছে কিনা জানতে চাওয়া মানে আপনার উৎসাহ কি কমেছে? বাইরের সমস্যা আসবে। একবার আমার এক বন্ধু আমাকে বলছিলেন, ‘ভাই তোমরা তো ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হলে, শান্তি কি পেলে, যেটার জন্য সব ছেড়ে বেরিয়েছিলে’? আমি বন্ধুকে বললুম, ‘শান্তি পাওয়ার জন্য কেউ ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয় না, আত্মজ্ঞানের জন্য সংসার থেকে বেরোয়’। যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশিফাই করে দিল, কিসের শান্তি তাঁর? শান্তি মানে, যার উৎসাহ শেষ। শুধু মাত্র ঈশ্বরীয় কথাতে তাঁর উৎসাহ, অন্য আর কোন কিছুতে উৎসাহ থাকে না। এই যে ঠাকুর বলছেন, কামিনী-কাঞ্চনে উৎসাহ, এটা চলে যায়। ভারত পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে, শুনতেই উৎসাহ এসে গেল, সব উৎসাহের ইতি—**শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ**। মন প্রাণ সব শান্ত হয়ে গেল।

গঙ্গার যত নিকটে যাবে ততই শীতল বোধ হবে। স্নান করলে আরও শান্তি। ধর্ম জীবন মানেই তাই। বিকালের দিকে বেলুড় মঠে প্রচুর দর্শনার্থীরা আসেন, সবাই খুব প্রশংসা করেন, বাঃ কি সুন্দর জায়গা। গরমের সময় গঙ্গার পার ধরে হাঁটলে শীতল বায়ু মন প্রাণকে সতেজ ও নির্মল করে দেয়। কেউ গঙ্গার জল স্পর্শ করেন, কেউ স্নান করতে নেমে যান। আধ্যাত্মিক জীবনের দিক দিয়ে বেলুড় মঠের জন্য এটা আক্ষরিক ভাবে সত্য। বেলুড় মঠে এলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কিছুক্ষণ বসলেন, আরও ভাল। এইভাবে হতে হতে পুরো জীবনটাকে ঢেলে দিলেন, মন প্রাণ সব ঢেলে দিলেন, এটা হল গঙ্গায় স্নান করার মত। বেলুড় মঠের একদিকে যেমন গঙ্গা, ঠিক তেমনি মধ্যে ঠাকুর। এলেন, দেখলেন, প্রণাম করলেন চলে গেলেন, আপনি হলেন সাইট

সিইং টুরিস্ট। বসে দু-এক ঘণ্টা জপধ্যান করলেন, শরীর মন শীতল হল, মন প্রাণ ঠাকুরে ডুবিয়ে দিলেন, ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই, এটা হল, স্নান করে শরীর শীতল হওয়া। গঙ্গাকে দেখে লোকেদের যেমন হয়, ঠাকুরকে দেখে লোকেদের ঠিক এই তিনটে স্তরের অনুভূতি হয়।

তবে জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এ-সব, তিনি আছেন বলে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। সাংখ্য দর্শনের সাথে এখানে একটা বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। কথামতে ঠাকুর অনেকবার সাংখ্যদর্শনের কথা বলছেন, সত্ত্ব, রজো, তমোর কথা বলছেন; চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথা বলছেন, ঠাকুর যোগের কথা বলছেন, কিন্তু ঠাকুর হলেন বেদান্তী। হিন্দুদের ধর্মই বেদান্ত, বেদান্তই সত্য। এই যে বলছেন, এ-সব তিনি আছেন বলে সব আছে। গীতায় ভগবান বলছেন, আমিই এই সব কিছু হয়েছি। সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন মনে করে প্রকৃতি হল একটা স্বাধীন সত্তা, ঠাকুর কিন্তু এই কথা বলছেন না, যদি কখন বলে থাকেন, তাহলে সেটা হল ওটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য; ঈশ্বর আছেন বলেই এইগুলো। বলছেন, ১-এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। ১-কে পুঁছে ফেললে শূন্যের কোনও পদার্থ থাকে না। ‘১’ আর ‘০’, ১-এর পিঠে যেমন যেমন শূন্য দেওয়া হবে তেমন তেমন ওর দাম বাড়ে। কিন্তু ১ যদি সামনে না থাকে তখন সব শূন্য শূন্য হয়ে থাকবে, কোন দাম থাকবে না।

আমি একবার আমার বন্ধুদের বলছিলাম, ‘ঈশ্বর যদি সত্য হন, তাহলে জগতে আর পাওয়ার মত কি আছে। ঈশ্বরই যদি থাকেন, তাহলে জগতে কি পাওয়ার মত কিছু থাকবে? আর ঈশ্বর যদি সত্য না হন, তাহলে কি জগতে আর পাওয়ার মত কিছু থাকে? জন্মালাম, মরে গেলাম, সব শেষ; কি নিয়ে এত মাতামাতি’। দুটোর যেটাই হোক—যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহলে পাওয়ার মত জিনিস হল একমাত্র ঈশ্বর আর উল্টোটা, ঈশ্বর যদি না থাকেন—তাহলে পাওয়ার মত কিছুই নেই, সবে বেকার, ফালতু, অর্থহীন।

এই কথাগুলো ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণকে বোঝানোর জন্য বলছেন। প্রাণকৃষ্ণের এই সমস্যাটা ছিল, উনি জ্ঞানবিচারটা বেশি করতেন। প্রাণকৃষ্ণ কোথাও ভুলে যাচ্ছেন যে, সমস্ত সাধনার আসল উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, সমাধি লাভ। এটাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ঠাকুর এখানে এত জোর দিয়ে বলছেন—এই যে বিচার, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এত যে কথা বলা হচ্ছে, ভাবা হচ্ছে, এগুলো অবশ্যই ভাল; কিন্তু মূল যেটা, সেটা যেন হারিয়ে না যায়। এই মায়ার জগতে যাবতীয় যা কিছু দেখাচ্ছে, এগুলো সব শূন্যের মত, কিন্তু আসল হল সব শূন্যের আগে ‘১’। ওই ‘১’ যদি ঠিক থাকে তখন সব শূন্যের একটা দাম এসে যায়। পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ, আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন, উনি খুব সুন্দর বলতেন—Ranganathananda minus Ramkrishna Mission is zero। সঙ্ঘের যে শক্তি, এই শক্তিতেই আমাদের মঠের এক একজন মহারাজ এত উপরে ভেসে উঠছেন। সঙ্ঘের শক্তি যদি চলে যায়, কেউ কিছু না। ঈশ্বর যদি না থাকেন তাহলে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব অর্থহীন।

মাস্টারমশাই ভাবছেন, প্রাণকৃষ্ণকে কৃপা করিবার জন্য ঠাকুর কি এইবার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন? আমি মহারাজদের দেখেছি, ওনারা কারুর সাথে কথা বলতে চান না। আমি নিজেও কারুর সঙ্গে কথা বলতে চাইনা। কোন কারণে সাত দেউড়ি পেরিয়ে কেউ যদি আমার কাছে পৌঁছে যায়, একটু হ্যালো হাই করি। ঠাকুরও ঠিক তেমনি, ঠাকুরের কাছে কেউ যদি পৌঁছে যেত, আর সত্যিকারের তার মধ্যে যদি আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা থাকত, ঠাকুর ঠিক পথে তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কৃপা করতেন।

**ঠাকুর বলিতেছেন—**

ব্রহ্মজ্ঞানের পর—সমাধির পর—কেহ কেহ নেমে এসে ‘বিদ্যার আমি’, ‘ভক্তির আমি’ লয়ে থাকে। আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। আমাদের কাছে রোজ এত প্রশ্ন আসে, বেশির ভাগ প্রশ্নের

উত্তর দিই না, উত্তর দেওয়ার সময় কোথায়। একটু মন দিয়ে যদি আমাদের এই আলোচনাগুলো শোনেন, তখন দেখবেন আপনার মনে যে-সব প্রশ্ন আসে, সেই প্রশ্নের বিষয়কে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আপনার নলেজ বেস নেই, জ্ঞানের রাশি তৈরী হয়নি, খালি প্রশ্ন আর প্রশ্ন। ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসছেন তাঁদের মনেও অনেক প্রশ্ন উঠছে। এই যে ঠাকুর শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলছেন, তাহলে ঠাকুর নিজে কেন এত কথা বলছেন? তাহলে কি ঠাকুরের জ্ঞান হয়নি? এই প্রশ্ন কোন না কোন সময় উঠবে। আচার্য শঙ্করের স্টাইলে যদি ভাষ্য লেখা হয়, ঠিক এই প্রশ্ন হবে—ঠাকুর বলছেন, তখন সব কথা বন্ধ হয়ে যায়, ত্রৈলোক্যস্বামীর মত; তাহলে কি ঠাকুর ত্রৈলোক্যস্বামী থেকে নিচে, যিনি এত কথা বলে যাচ্ছেন? না, ঠাকুর এখানে এটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন—কেউ কেউ বিদ্যার আমি, ভক্তির আমি নিয়ে নেমে আসেন। এখন যে আমিভূ, এই আমিভূ আগের আমিভূ না, দুটো আমার মধ্যে বিরাট তফাৎ হয়ে গেছে।

বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খুশি বাজারে থাকে। যেমন নারদাদি। ইদানিং বাজারগুলো অন্য রকম হয়ে গেছে। আমাদের এখানে বেলুড় বাজার আছে, ওখানে ঘুরে দেখার মত কিছু নেই। বাজার চুকে গেলে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে কত তাড়াতাড়ি বাজার ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু মল আদিত্তে যান, সেখানে অনেকেই কেনাকাটা সেরে ঘুরে ঘুরে দোকানের বাহার দেখতে থাকবে। আগেকার দিনে লোকেদের বিনোদনের উপকরণ খুব সীমিত ছিল। বাজারে গেলে যে কাজ ছিল আগে সেটা করে নিল, এরপর ঘুরে ঘুরে বাজার দেখছে।

এই জগৎ একটা বাজার, এখানে কেনার মত একটাই জিনিস, ঠাকুরের কথাতে, ঈশ্বরজ্ঞান। আমাদের পরম্পরাগত হিন্দু ধর্মে বলছেন—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্ম, অর্থ, কাম এরাও শেষে মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। অর্থসাধনের দ্বারা সাংসারিক চাহিদার নিবৃত্তি হয়ে যায়। কামসাধনের দ্বারা মনের চাহিদাগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ধর্মসাধনের দ্বারা অশুভ যোনিতে জন্ম নেওয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর মোক্ষসাধনের দ্বারা আত্মাত্মিক মুক্তি আসে, সব কিছু থেকে মুক্তি লাভ হয়। হিন্দু ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য—মুক্তি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সাধন যে করা হয়, সেখানেও আসলে মুক্তির ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে; দেহের চাহিদা থেকে মুক্তি, মনের চাহিদা থেকে মুক্তি, শুভ যোনিতে যেন জন্ম হয়, অর্থাৎ অশুভ যোনিতে জন্ম নেওয়া থেকে মুক্তি আর শেষে সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি। মুক্তি লাভের পরেও কেউ কেউ থাকেন, যাঁদের সে-রকম কোন আগ্রহ নেই, সবই তাঁর জানা, তাঁরা ওই রকম বেরিয়ে চলে গেলেন।

তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য ‘ভক্তির আমি’ লয়ে থাকেন। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিলেন। আমাদের সন্ন্যাসী ভাইরা যাঁরা আছেন, এনারাও যখন তর্ক করেন, কোন আলোচনা করেন আমি তাঁদের বারবার বলি—একটা জিনিস সব সময় মনে রাখবেন, ঠাকুর নিজে শঙ্করাচার্যের নামে বলছেন যে, শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিলেন, ঠাকুর একজন অবতার, একজন সমাধিবান পুরুষ, এনার কথাকে প্রশ্ন করা যায় না। ঠাকুর বলছেন, শঙ্করাচার্য অবতার, ওনার জন্মটাই লোকশিক্ষার জন্য। এই লোকশিক্ষার জন্য তিনি বিদ্যার আমি রেখেছিলেন।

একটু আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। আগে যেটা বলেছিলেন, আসক্তি থেকে উৎসাহ, একটু আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সূতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর যাবে না। এই অভিজ্ঞতা আমাদের কমবেশি সকলেরই আছে, ছুঁচে সুতো ভরতে কত সমস্যা হয়। আসলে যোগশাস্ত্র জানা থাকলে এগুলো বুঝতে সুবিধা হয়। মনে একটাও যদি চিন্তা-ভাবনা থাকে, দুটো না, একটি চিন্তা যদি থাকে আপনাকে মুক্ত হতে দেবে না।

যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তাঁর কাম-ক্রোধাদি নামমাত্র। কথা আর ইমোশান দুটো আলাদা জিনিস। যে কোন কথা বা যে কোন ক্রিয়া তিনটে স্তরে চলে। একটা হল অর্থহীন। অনেকে আছে, বসে বসে পা নাড়িয়ে যাবে, অকারণে পা নাড়াটা একেবারেই অর্থহীন। অনেকে আবার সারাদিন বকর বকর

করেই যাবে, তারা যে কথাগুলো বলে যার কোন অর্থই নেই। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, রাস্তায় যখন লোকেরা ঝগড়া করে তখন একজন আরেকজনকে বলবে, ‘আরেকবার বল, দ্যাখ তোকে কি করছি’। সব মুখের কথা ভিতরে কোন দম নেই। ছেলেমেয়ে একে অপরকে বলেই যাচ্ছে, ‘আমি তোমাকে ভালবাসি’—সব মুখের কথা মাত্র। দ্বিতীয় স্তর হল, শব্দের পিছনে ইমোশান থাকে। কামের হোক, লোভের হোক, ক্রোধের হোক, মোহের হোক, এই কথাগুলিই পাওয়ারফুল হয়ে যায়। আমাদের স্মৃতি, এই স্মৃতি শব্দ দিয়ে হয় না, হয় ইমোশান দিয়ে। আমাদের শাস্ত্রের কথা শুনছেন, অনেক দিন ধরে শুনছেন, কিন্তু মনে থাকছে না, কারণ ওখানে আপনার ইমোশান জড়িয়ে নেই।

আগেকার দিনে বাচ্চাদের বেদ মুখস্ত করানো হত, যেটা আজও চলছে। ওনারা জানেন বাচ্চাদের কোন ইমোশান জড়িয়ে নেই বলে মুখস্ত রাখতে পারবে না, ওনারা তাই হাত নেড়ে নেড়ে নিউরোমোটরে সিনক্রোনাইজ করে মুখস্ত করাতেন। তার মানে ওখানে কৃত্রিম ভাবে ইমোশানকে সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে মুখস্ত করতে পারে, কথাগুলো তখন মনে ছাপ পড়ে। আমাদের মনেও কথার তখনই ছাপ পড়ে, যখন যিনি বলছেন, তাঁর মধ্যে যদি ইমোশানস্ থাকে।

**যেমন পোড়া দড়ি। দড়ির আকার। কিন্তু ফুঁ দিলে উড়ে যায়।** তৃতীয় স্তরে, ঈশ্বরীয় জ্ঞান হওয়ার পর তিনি যে কথাগুলো বলবেন, সেই কথাগুলো ঈশ্বরীয় জ্ঞান থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন সেই শব্দগুলির পিছনে একটা আলাদা শক্তি থাকে। কিন্তু বলতে পারেন, যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে, জ্ঞানীর তো ইমোশান নাশ হয়ে গেছে। ফলে কি হয়, যদি বলেন, আমি এটা করব, আমি এটা খাব, এই কথাগুলো কামজনিত নয়। ঠাকুর যখন কারুর উপর রাগ করছেন, এটা ক্রোধবশত না। ক্রোধের পিছনে যে ইমোশানস্, তাঁদের সেই ইমোশান থাকে না। ওনারা যখন ঈশ্বরীয় কথা বলেন, তখন তাঁর কথার মধ্যে পুরো ঈশ্বরীয় সত্তা আসছে। এখানে ওনারা খুব সুন্দর উপমা দেন—পোড়া দড়ি। পোড়া দড়ি দড়ির মতই দেখতে লাগবে, কিন্তু আকার মাত্র, সেই দড়ি দিয়ে কোন কাজ হয় না।

আপনাদের এসব কথা শুনে মনে হতে পারে, এগুলো শুনে কি হবে, আমরা তো ওই অবস্থায় কোন দিন পৌঁছাতে পারব না। পৌঁছাতে পারা না পারাটা কিছু না, এগুলো সবাইকে জানতে হয়। এইজন্যই জানা—এটাই আমার জীবনের আদর্শ, এই লক্ষ্য আমাকে পৌঁছাতে হবে। আগামীকাল আপনার মধ্যে যদি কাম, ক্রোধের উদয় হবে, তখন আপনার মনে হবে—এই তো কথামতে শুনলাম কাম ক্রোধ এগুলো পোড়া দড়ির মত। পোড়া দড়িকে একটু ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। সাধু মহাত্মাদের যে কাম ক্রোধ আছে, ওগুলো কিছু না, একটা ফুঁ মারলে উড়ে যাবে। আর যাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের কথা তো আলাদা, তাঁদের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই না।

**মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁকে দর্শন হয়।** ঠাকুর বারবার আসক্তিকে নিয়ে বলছেন। আসক্তি জিনিসটা মজার। আসক্তি বললে আমরা প্রায়ই ভাবি যে, কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি, কোন ব্যক্তির প্রতি আসক্তি। আসলে আসক্তি কখন কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তুর প্রতি হয় না। একটা বাচ্চা ছেলে চকলেট খুব ভালবাসে, খেলাধূলা করতে ভালবাসে, আচার্যের ভাষায় *তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্ত*, যুবক যুবতীকে ভালবাসে। এগুলো দেখলে সবারই মনে হবে, সবটাতেই বস্তু আর ব্যক্তিকে ভালবাসছে। তা না, বস্তু ও ব্যক্তিকে আমরা কখনই ভালবাসি না। আমাদের আসক্তি কখন কোন ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি থাকে না। কারণ আমাদের কাছে যত জ্ঞান আসে সব জ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আসে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে এসে সেটা মনে যায়। মন বস্তু ও ব্যক্তিকে তফাৎ করতে পারে না। মন হল দাঁড়িপাল্লার মত, দাঁড়িপাল্লা জানে না এটা সোনা না লোহা। মনও বস্তু ও ব্যক্তিতে তফাৎ করতে পারে না, মনের কাছে এটা শুধুমাত্র একটা sensation, মনে একটা ক্রিয়া হল। বোঝার জন্য ওখানে একটা বিশেষণ লাগিয়ে দেয়—এটা ব্যক্তি, এটা বস্তু, এটা বর্তমান, এটা অতীত।

মনের কাছে সব কিছুই একটা আইডিয়া নিয়ে থাকে। মনের কাছে সব কিছু একটা বিচার মাত্র। যে বিচারকে নিয়ে অনেক বেশি দিন চলে, কিংবা যে বিচারের সঙ্গে খুব পাওয়ারফুল ইমোশান জড়িয়ে আছে, সেই বিচারে গিয়ে মন আটকে যায়। যেমন বাচ্চাদের ছোট থেকেই সাবধান করে দেওয়া হয় যে, আগুনের কাছে যেতে নেই, পুড়ে যাবে। কিন্তু বাচ্চারা প্রথম প্রথম অতটা বুঝতে পারে না, কেন আগুনের কাছে যেতে নেই। কিন্তু একবার যদি আগুনে হাত লাগে, তারপর তার যে চিৎকার, তার পোড়া চামড়ার যে জ্বালা-যন্ত্রণা, যে বেদনা; তার যে ইমোশান, সেই ইমোশানের সঙ্গে যে জ্ঞান বা বিচার জড়িয়ে যায়, সেটা তার মনে এমন ছাপ ফেলে, যেখানে ঠাকুর যেটাকে আসক্তি বলছেন, সেখানে ওই জ্ঞানের প্রতি এমন আসক্তি হয়ে যায় যে, আগুনে হাত দিলে আমি পুড়ে যাব, এই জ্ঞান তার আর কোন দিন মুছে যাবে না। কিন্তু এরপরেও মানুষকে রান্নাবান্না ও অনেক কাজের জন্য আগুনকে ব্যবহার করতে হবে, তখন সে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে।

এই ইমোশানসগুলো দু-ভাবে তৈরী হয় —আপনি অনেকদিন একটু একটু করে সাধন-ভজন করে যাচ্ছেন, ধীরে ধীরে একদিন সাধন-ভজনটাই একটা পাওয়ারফুল ইমোশান হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এই কারণেই বলা হয় —জপধ্যান ছাড়তে নেই। কারণ জপধ্যানের জন্য যে পাওয়ারফুল ইমোশানস আসবে, সেটা আপনার এখন নেই। ঠাকুর আগে আগে কারুর মধ্যে করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা সম্ভব না, কাকে করেছিলেন, কেন করেছিলেন আমরা জানি না। সেইজন্য এর দ্বিতীয় উপায় —ধীরে ধীরে ওটাই করে যাওয়া। নিউরো বিজ্ঞানের ডাক্তাররা বলেন —বেশ কিছু ওষুধ আছে, যে ওষুধ একটু একটু করে অনেকদিন ধরে খাওয়ানো হলে ওটা জেনেটিক চেঞ্জ করে দেবে, জিনস্কে পালটে দেয়। ভাইরাসগুলো খুব unstable, একটু কিছু হল, ওতেই ওরা জেনেটিক চেঞ্জ করে নেয়। সেই তুলনায় মানুষ অনেক stable। অনেক দিন ধরে যদি মানুষকে কোন কিছু দেওয়া হতে থাকে, আস্তে আস্তে ওর জেনেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমাদের ইমোশানসগুলো ঠিক ওই রকম, এটা উদাহরণের জন্য বলা হয়েছিল। একটু একটু যদি অনেক দিন ধরে দেওয়া হয়, মানুষের সেটার প্রতি আসক্তি জন্মে যাবে।

নল-দময়ন্তি কাহিনীতে আমরা পাই, যেখানে নলের কাছে দময়ন্তির রূপ-গুণের বর্ণনা করা হচ্ছে, দময়ন্তির কাছে নলের কীর্তি-বীরত্বের বর্ণনা করা হচ্ছে, তাতে ওদের দুজনের মধ্যে এত পাওয়ারফুল ইমোশানস এসে গেছে যে, কেউ কাউকে না দেখতেই দুজন দুজনের প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। জীবনে যদি কোন একটা সময় একজন খুব বিখ্যাত লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হয়ে থাকে, ওই স্মৃতিটা তার কোন দিন মুছে যাবে না। তার মানে, খুব পাওয়ারফুল ইমোশান কিছুক্ষণের জন্য এসেছিল। কেউ যদি আপনাকে গালাগাল দেয়, চল্লিশ বছর পর বলবে, ‘আমার মনে আছে তুমি আমাকে কি বলেছিলে’। ‘কত দিন আগে বলেছিলাম’? ‘চল্লিশ বছর আগে’। ‘চল্লিশ বছর আগের কথা এখনও মনে রেখেছেন’? কারণ তখন তাকে রেগে যে কথা বলা হয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে এত পাওয়ারফুল ইমোশান হয়ে ওটা এসেছিল যে, ওই চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মন জড়িয়ে থেকে গেছে। এটাই হল আসক্তি।

যোগশাস্ত্র আসক্তির দুটো রূপের কথা বলেন —রাগ আর দ্বেষ। রাগ আর দ্বেষ, দুটোতেই আসক্তি হয়। রাগটা যেমন আসক্তি, তেমনি দ্বেষটাও আসক্তি। *দুঃখানুশায়ী দ্বেষঃ*, যেখানে দুঃখ পেয়েছিলাম, বা যেখানে দুঃখ পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে —এটা হল দ্বেষ। কিন্তু সাধারণ ভাবে আমাদের জীবনে দুঃখ কম থাকে, বিভিন্ন রকমের আসক্তি বেশি থাকে, পাওয়ার ইচ্ছা অনেক বেশি থাকে; কারণ আমরা হলাম অপূর্ণ কাম, সব সময় আমাদের এটা পাওয়ার ইচ্ছা, সেটা পাওয়ার ইচ্ছা, ওটা পেতে চাই সেটা পেতে চাই। এমনকি যাকে পছন্দ করি না, তার নাশ হোক, এটাও আসক্তি। এই ইচ্ছাটাও কামনার মধ্যেই পড়ে। যে আমার অপছন্দের, তার থেকে আমরা দূরে থাকতে চাই —সব কিছু ঘুরে ঘুরে কামনার মধ্যেই পড়ে যায়।

শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। মন থেকে আসক্তি চলে গেছে, মন শুদ্ধ হয়ে গেছে। এই শুদ্ধ মনে যা কিছু উঠবে তাতে কোন আসক্তি নেই। আমরা আগে একটা আলোচনা করেছিলাম, যেখানে ঠাকুর বলছেন, রতির মার বেশে, কিংবা বলছেন, এগুলো যদি সত্য হয়, পাথর তিনবার লাফাবে — এগুলো হল, মন এমন শুদ্ধ হয়ে গেছে যে, সেই শুদ্ধ মনে যেটা উঠবে সেটা ঈশ্বরেরই বাণী। সেখানে আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম, স্বপ্ন আমরা যখন দেখি সেখানে মন আমাদের বলে দেয়, এটা অমুক, এটা সেই, ওটা সেই। যার মন আসক্তিশূন্য, যার শুদ্ধ মন, তার মনে যেটা উঠবে, সেটা ঈশ্বরের বাণী।

শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ বুদ্ধিও তা —শুদ্ধ আত্মাও তা। যখনই আমরা যা কিছু পাই, সেটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনে আসছে। মন তখন সেগুলোকে বিচার করে। আগে থেকে যে জ্ঞানরাশি রয়েছে, সে জ্ঞানরাশির সাথে তুলনা করে ঠিক করে নেয়, এটা এই —এটাকে বলছি বুদ্ধি। রাজযোগে চারটে জিনিসের কথা বলা হয় —চিত্ত, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার। মন যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছে, তখন তাকে চিত্ত বলছি। যখন বিচার করে, এটা ঠিক না বেঠিক, তখন তাকে বলছি মন। বুদ্ধি বলছি, যেখানে নিশ্চিত করে বলে দিচ্ছে এটা এই, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আর যখন নিজেকে কোন কিছুর সাথে জুড়ে দিচ্ছে, সেটাকে বলছি অহঙ্কার। উপমা দিয়ে বোঝানর জন্য বলা হয় —অন্ধকারে আপনি যাচ্ছেন, কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ সেখানে আপনি কাউকে দেখলেন, এই যে কাউকে দেখলেন —এটা হল চিত্ত। আপনি বিচার করতে শুরু করলেন —ওটা কি মানুষ না কোন পশু। আরও কাছে গিয়ে দেখছেন, একটা মানুষ। এটা দেখার পর আপনার জ্ঞান স্থির হয়ে গেল। তারপর আরও ভাল করে দেখে জানতে পারলেন —আরে এতো আমার বন্ধু বা একজন পুলিশ বা ডাকাত। এটা হল অহঙ্কার, যেখানে বস্তুর সাথে নিজেকে জুড়ে দেয়। এখানে অহঙ্কার জিনিসটা চলে গেছে। এখানে মনকে বলছেন, বুদ্ধিকে বলছেন, আত্মাকে বলছেন; অহংটা বলছেন না, অহংটা সরে গেছে। কারণ অহঙ্কার কখন শুদ্ধ হয় না। ঠাকুর রাধার কথা বলছেন —এই অহং কার? ঈশ্বরের অহং, ঈশ্বরের আমি, বলছেন ঠিক আছে; কিন্তু এ-জিনিস হয় না। অহঙ্কারের নাশ হয়ে গেলে সেখানে কোন রাগ নেই, কোন ঘেঁষ নেই, কোন কামনা নেই, কোন কিছু নেই। তার মানে, যখন কোন কিছু দেখবেন, জিনিসটা যেমন ঠিক তেমনটি দেখাবে। এটাকে বলে যথাবৎ, যেমনটি আছে তেমনটি দেখছেন। তখন শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক।

কেননা তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই। প্রাণকৃষ্ণের সাথে ঠাকুরের এতক্ষণ আলোচনা চলছে, সব আলোচনা করে এই সত্যে উপনীত হচ্ছেন —কেউ শুদ্ধ নেই, একমাত্র ঈশ্বর শুদ্ধ। বলা হয় শুদ্ধ চৈতন্য। কেন? আমিত্ব নেই। অশুদ্ধ বলতে কি? আমিত্ব। যেখানেই আমিত্ব সেখানেই অশুদ্ধ। অশুদ্ধ বলতে আমরা মনে করি, নোংরা, অপবিত্র; একেবারেই না —যেখানেই আমিত্ব জুড়ে যায় সেখানেই অশুদ্ধ। যেখানে অহংকার আছে, আমিত্ব আছে, সেটাই অশুদ্ধ, অপবিত্র। যতক্ষণ ঈশ্বরের সঙ্গে এক না হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ আমরা সবাই অশুদ্ধ, অপবিত্র। ঠাকুর তাই খুব সুন্দর বলছেন —তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই। আপনাকে যদি কেউ বাজে বলে, জানবেন যে বলছে সেও কিন্তু বাজে। কারণ ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ শুদ্ধ নয়। আমিত্ব, এই অহংকার সবারই ভিতরে আছে। এই অহং বস্তুর সঙ্গে জুড়ে যায়, ওই স্তরে গিয়ে ঈশ্বরজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে কোন তফাৎ আসে না। যদি বলেন আমি ভাল বা শুভতে আসক্ত, সেটাও আসক্তি। মন্দে আসক্ত, সেটাও আসক্তি। তমোগুণ যেমন বাঁধে, রজোগুণও বাঁধে, তেমনি সত্ত্বগুণও বাঁধে।

ঠাকুর তাই শেষে বলছেন —তাকে কিন্তু লাভ করলে ধর্মাধর্মের পার হওয়া যায়। গীতা ভাষ্য লিখতে গিয়ে শঙ্করাচার্য অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে বলছেন —সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য, ধর্ম অধর্ম দুটোকেই ছাড়তে হবে। কারণ ঈশ্বরজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে যেটা ধর্ম, সেটাও অধর্ম, কারণ সেটাও বন্ধন। যেটাকে আমরা পুণ্য বলি, সেটাও ওই দৃষ্টিতে পাপ। কারণ তখন পুণ্যটাও বন্ধন। আমাদের ভাষায় পুণ্যের একটা বিশেষ অর্থ আছে, পাপের আলাদা একটা বিশেষ অর্থ আছে। তেমনি ধর্মের একটি অর্থ আছে, অধর্মেরও একটি অর্থ আছে। কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মন

এগুলোর কোনটাকেই তফাৎ করতে পারে না। একটু আগে মনের ব্যাখ্যা করা হল, মন জানে এগুলো আমার কাছে একটা চিন্তা মাত্র। যেমন দাঁড়িপাল্লা জানে আমার কাছে সব ওজন। মন ধর্ম বোঝে না, অধর্মও বোঝে না; পাপ বোঝে না, পুণ্যও বোঝে না; ভাল বোঝে না, মন্দও বোঝে না; সে বোঝে ওজন। একমাত্র ঈশ্বরই শুদ্ধ, কারণ তিনি এই মনের পারে। ঈশ্বর বই আর কিছু শুদ্ধ না, জীবনের উদ্দেশ্য শুদ্ধ হওয়া। শুদ্ধ হওয়া মানে পাপ-পুণ্যের পারে, ধর্ম-অধর্মের পারে যাওয়া।

পারে যাওয়া একদিনে তো হবে না, তার আগে সব কিছুর আসক্তি ত্যাগ চাই। ঠাকুর বলছেন, জীবনে একটা শান্তি আনার চেষ্টা; শান্তি ভিতর থেকে, বাইরের শান্তির কথা বলছেন না। প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে ঠাকুর যে কথা বলছেন, সব কথার একটাই উদ্দেশ্য – আসক্তি ত্যাগ কর। আসক্তি ত্যাগ করলে মন শুদ্ধ হবে, বুদ্ধি শুদ্ধ হবে, অহংকার পুরোপুরি নাশ হয়ে যাবে। অহংকারের অর্থ এখানে গর্ব বা দর্প না, আমিত্বের সাথে যেটা জুড়ে যায়। এই জুড়ে যাওয়াটা নাশ হলেই ঈশ্বর যেমন শুদ্ধ, তেমনি আপনার মন, বুদ্ধি সব পবিত্র হয়ে যাচ্ছে, ঈশ্বরের সঙ্গে সে এক হয়ে যাচ্ছে, এটাই মুক্তি। এই কথা বলার সাথে সাথে ঠাকুর রামপ্রসাদী গান করছেন – আয় মন বেড়াতে যাবি কালী-কল্পতরুমূলে রে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরাধার ভাব

আমরা ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আলোচনার চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছি (পৃঃ ১৩৫)। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসে আছেন। সেখানে প্রাণকৃষ্ণ আদি ভক্তরাও সঙ্গে আছেন। বারান্দায় হাজরা মহাশয় বসে আছেন। শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিতদের যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আমরা দেখছি, চারিদিকে দেখছি শুধু দুঃখ আর দুঃখ। একটা জিনিসকে পেতে দুঃখ, পাওয়ার পর ধরে রাখতে দুঃখ, জিনিসটা চলে গেলে দুঃখ, সর্বত্র দুঃখময়ম্। আধ্যাত্মিক জীবন এই দুঃখ থেকেই শুরু হয়। একটা খুব উচ্চমানের অবস্থায় মানুষ দুঃখ ভোগ করার আগেই বুঝতে পারে এই জিনিসটা আমাকে দুঃখ দেবে। সরকার কত সাবধান করে দেয়, সিগারেট খেতে নেই, মদ খেতে নেই; তাও মানুষ খায়। জেনেও মদ খায়, সিগারেট খায়, কারণ কিছু তো আনন্দ পায়। কিছু পায় বলেই ওই জিনিসটাকে ধরে আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কত ঝগড়াঝাঁটি, কত মনোমালিন্য, দেখে মনে হয় ছেড়ে দিলেই তো হয়, কিন্তু কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না। কোথাও এমন একটা বাঁধন আছে, এমন একটা সুখ আছে, যেটা দুজনকে জুড়ে রেখেছে। জন্মজন্মান্তরের দুঃখরাশি জমতে থাকে, অন্য দিকে পুণ্যরাশিও একটু একটু করে জমতে থাকে। তখন একটা সময়ে বলে, আর না, এবার আমি এর থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। ধর্মজীবন এখান থেকেই শুরু হয়।

বাংলা ভাষা জানেন এমন কত কোটি কোটি লোক আছে, কিন্তু কজন আর কথামত শোনেন। কেনই বা শুনবেন, দরকার নেই তাই শোনেন না। তাদের ভাষায় জীবনটা একটা প্যাকেজ ডীল। জীবনে মন্দ অবশ্যই আছে, কিন্তু ভালও তো আছে। মানুষ বলে, ওই অতটুকু সুখ পাওয়ার জন্য, আমার প্রিয়জনের মুখে ওইটুকু হাসি দেখার জন্য আমি সব কষ্ট পেতে রাজি আছি। যখন মানুষ বলে আমার এসব লাগবে না, সুখও চাই না, দুঃখও চাই না, তখন সে ধর্মজীবনে পা রাখে। আমাদের ধর্মে যাঁরা জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণরা ছিলেন, প্রত্যেক ধর্মের এ-রকম জ্ঞানবৃদ্ধ থাকেন, তাঁরা চান অল্প বয়স থেকেই যেন এই জ্ঞান একটু একটু করে দেওয়া হতে থাকে, যাতে সময় হলে সে সঠিক পথে চলে যেতে পারে।

হিন্দুরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, ব্রাহ্মণ নামে তাঁরা আলাদা একটা জাতি সৃষ্টি করে দিলেন, যাঁদের কাজ হল এই জ্ঞানকে পুরোপুরি ধরে রাখে, আর নিজের জীবনে যাতে যতটা সম্ভব এই



জ্ঞানকে নামাতে পারে। বর্তমান কালের ব্রাহ্মণদের সাথে এনাদের তুলনা করবেন না, আমরা এখানে পরম্পরা ধর্মের কথা বলছি। এই ব্রাহ্মণরা কি করলেন, এনারা বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি সব শাস্ত্রকে ধরে রাখলেন। যদি আপনি এই গ্রন্থগুলি পড়েন, তাহলে দেখবেন সব শাস্ত্র একটাই কথা বলছেন — একটাই উপায় — ত্যাগ। যাঁরা জ্ঞানী, যাঁদের এই বোধ এসেছে যে *সর্বং দুঃখময়ম্*, এই জগৎটা দুঃখময়, তাঁরা তখন সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে দেন — এটাকে বলে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, ত্যাগের পথ অবলম্বন করা। ঈশোপনিষদে এটাকেই বলছেন *ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যাঞ্জন ভুক্তিথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্*, সমস্ত ত্যাগ কর। কিন্তু যাঁদের পুরোটা যায়নি, এখনও টুকটাক একটু কামনা-বাসনা আছে, তাঁদের বললেন, তোমরা কর্মফল ত্যাগ কর, আসক্তি ত্যাগ কর। কুকুর যেমন খাওয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ও-রকম ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো না, একটু বিচার করে, সংযত ভাবে ভোগ কর। কিন্তু আমরা তাও পারি না। কিন্তু জ্ঞানীরা ক্রমাগত এই কথা বলতেই থাকেন — শেষ অবস্থায় কর্মের ত্যাগ, প্রথম অবস্থায় কর্মফলের ত্যাগ।

কর্মফল ত্যাগ মানে নিঃস্বার্থপর হওয়া। এটাকে বোঝানর জন্য অবতাররা আসেন। অবতাররা এসে দেখান কিভাবে ত্যাগ করতে হয়, নিঃস্বার্থ কিভাবে হতে হয়, সংসারে পাঁকাল মাছের মত কিভাবে থাকতে হয়, সংসারে দাসীর মত কিভাবে থাকতে হয়। আমাদের এখানকার এক ছাত্র একদিন বলল, ‘সন্ন্যাসী হওয়ার কি দরকার আছে, শ্রীরামচন্দ্র তো সন্ন্যাসী ছিলেন না’। আমি তাকে বোঝালাম, ‘ঠিকই বলছ, শ্রীরামচন্দ্র সন্ন্যাসী ছিলেন না। শ্রীরামই নন, যত অবতার এসেছিলেন, কেউ সন্ন্যাসী ছিলেন না, বিশেষ করে যাঁদের আমরা ভগবান রূপে মানি — শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, বিষ্ণু, শ্রীরামকৃষ্ণ; কেউই সন্ন্যাসী নন’। কেন? কারণ সন্ন্যাসীদের অবতার দরকার পড়ে না; সন্ন্যাসীরা সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছেন যেখানে গীতা, উপনিষদকে তত্ত্ব বলে জানেন, যথার্থ বলে জানেন। আচার্যদের মুখে যখন তত্ত্ব কথা শোনেন, তাতেই তাঁদের জ্ঞান হয়ে যায়। আগের জন্মে এত মার খেয়েছেন যে, এখন বলছে, ‘না না আমার আর কিছু লাগবে না’। সন্ন্যাসীদের তাই অবতারের দরকার হয় না।

সংসারে যাঁরা আছেন তাঁদের অবতারকে বেশি প্রয়োজন, সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণাও বেশি। অবতার যখন আসেন তখন তিনি তাই সংসারেই থাকেন। সংসারে থেকে অবতার দেখান সংসারে কিভাবে থাকতে হয়। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা আছে, কৈকয়ীর মুখ দিয়ে রাজা দশরথের আদেশ হল, শ্রীরামচন্দ্রকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে। তিনি চলে গেলেন। আমরা দুটো পয়সা ছাড়তে চাই না, সেই আমরাই আবার শ্রীরামচন্দ্রের নিন্দা করি। রাজসিংহাসন ছেড়ে তিনি চোদ্দ বছর বনবাসে থাকলেন। আবার তাঁকে বলা হল, এই অযোধ্যা রাজ্য আপনার, তিনি নিয়ে নিলেন। যখন যেমন তখন তেমনটাই উনি মেনে নিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও একই জিনিস। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে কত কি কাণ্ড। একদিকে যুদ্ধ করছেন, আবার অন্যদিকে যুদ্ধ করাচ্ছেন। রাজনীতি করছেন, রাজনীতি করাচ্ছেন। কিন্তু সব সময় পুরো অনাসক্ত, নির্লিপ্ত। ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখে সংসারীরা এক আনা ত্যাগ করে। সন্ন্যাসীর কথা শুনলেই লোকেরা বলে, আরে উনি তো সন্ন্যাসী এই রকমই তো করবেন। একটু সন্ন্যাসীদের মত থেকে দেখুন, একটু মাঠে নামুন তারপরে বুঝবেন কত ধানে কত চাল। অবতাররা সেইজন্য নেমে পড়েন, এই দেখ, নামলাম। কথামতেই আসবে, যেখানে ঠাকুর বলছেন — আমারও তো ঘটবাটি আছে, আমারও তো ঘরবাড়ি আছে, কই আমার তো এ-রকম হয় না। এই প্রসঙ্গটা পরে পরে যেমন যেমন আসবে আমরা আলোচনা করব।

আপনারা যাঁরা কথামত শুনছেন, মেনেই নিচ্ছি আপনারা ঠাকুরকে অবতার রূপেই মানে। আপনার সত্যিই ধন্য, এই যে কোথাও একটা বিশ্বাস জেগেছে যে, ঠাকুর ভগবান। বাকি লোকেরা তো মানতেও চায় না, বুঝতেও চায় না, তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করার কোন ব্যাপারই নেই। আপনারা এখন পথ ধরার মুখে। একবার পথটাকে ধরতে পারলে, এরপর তিনি কৃপা করে আস্তে আস্তে আপনাদের টেনে নেবেন। অন্যান্য অবতার, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, এনাদের কথা আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রে পাই।

কিন্তু তার মধ্যে ঠিক ঠিক ওনার কটি কথা; সন্ত, মহাত্মা, ঋষিরা যেমন রচনা করেছেন, তার মধ্যে কতটা কার কথা আমরা জানি না। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরাও খুব উচ্চমানের সাধক। কিন্তু ঠাকুর যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমনটি সেই ভাবে কথামৃতের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। ফলে ঠাকুরের কথাগুলি বুঝতে, বিশ্বাস করতে অনেক সুবিধা।

এই যে অন্ধকার জীবন, কথামৃতে ঠাকুরের কথাগুলো কেমন একটা আলোকবর্তিকা, টিমটিম করে আলো দিচ্ছে না, একেবারে স্পষ্ট, পরিষ্কার সার্চলাইটের আলো। সন্ন্যাসের আগে আমিও সংসারে ছিলাম, জীবনটা তখন কেমন ছিল; এখন ভাবলে আতঙ্ক লাগে। আপনারাও যেখানে আছেন সেখানে এক রকম আছেন, তার বাইরে চলে গেলে তখন অন্য রকম মনে হবে। কেন? কারণ আমরা যে চিন্তা-ভাবনাতে থাকি, দীর্ঘকাল যখন একটা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে থাকা হয়, সেই চিন্তা-ভাবনাটাই সত্য বলে বোধ হয়। ধরুন একজন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে কিছু একটা থিয়োরি বার করলেন। পরবর্তিকালে আরও গবেষণা করে বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণিত করে দিলেন যে তিনি যে থিয়োরিটা বার করেছিলেন সেটা ভুল। তারপরেও তিনি কিন্তু ওটা ছাড়তে পারবেন না। একটা জিনিসকে নিয়ে অনেক দিন থাকতে থাকতে কি হয়, মনের যে ইমোশানসগুলি বেরোয়, ওই কথাটাকে সত্য বলে মনে গেঁথে দেয়। কিন্তু অন্যদের কাছে অনেক দিন না থাকার জন্য তাদের পক্ষে সেটাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া সহজ। সংসার, সংসারের চিন্তা সংসারীদের কাছে সত্য। কেন? অনেকদিন সংসারে আছেন তাই।

আপনার বাবা, মা, আপনার স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, এরা সবাই আপনার কাছে খুব important। কিন্তু সত্যিই যদি তাঁরা important হতেন, অপরের জন্যও তাঁরা important হতেন; কিন্তু অন্যদের কাছে তাঁরা তো important নন। কারণ আপনার চিন্তা ভাবনাতে, আপনার মনের ভিতরে অনেক দিন থেকে থেকে সংসার একটা বিরাট আকার ধারণ করে নিয়েছে। এটাকে কি করে তুলে ফেলা যাবে? তুলে ফেলে দেওয়া সম্ভব না। জীবনে সংসারে থেকে, কাছের লোকদের থেকে যদি প্রচুর কষ্ট পান, তাহলেও দেখবেন চেষ্টা থাকে একটু যদি সুখ পাওয়া যায়, তাতেই আমরা সব কষ্ট মেনে নিতে রাজি হয়ে যাই। পাণ্ডবরা বললেন, আমাদের শুধু পাঁচটা গ্রাম দিয়ে দিন, তাতেই আমরা তেরো বছরের বনবাসের সব দুঃখকষ্ট ভুলে গিয়ে দুর্যোধনকেই রাজা বলে মেনে নিতে রাজী আছি। ভাগ্যিস কৌরবরা রাজী হয়নি, তাহলে আমরা আর মহাভারত, গীতা পেতাম না। সংসার যদি অতটুকু সুখ আপনাকে দিয়ে দেয়, তাহলে নূতন আর মহাভারত তৈরী হবে না। ওই অতটুকু সুখ যদি না দেয়, তবেই আর-এক মহাভারত রচিত হবে। জীবনে যখন কষ্ট আসে, দুঃখ যখন আসে; এই দুঃখ-কষ্ট আপনার ওই পুরনো চিন্তা-ভাবনাগুলিকে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। এরপর নূতন চিন্তা-ভাবনা আসা শুরু হয়।

আপনারা যাঁরা কথামৃত শুনছেন, আমরা ধরেই নিচ্ছি আপনাদের অতটা দুঃখ-কষ্ট নেই বা যদিও থাকে সেটা খুব বেশি গুরুত্ব নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল, যেটার জন্য এত কথা বলা; সংসারে আছেন, সংসার করছেন সব ঠিক, ওর মধ্যে ঠাকুরের কথামৃতের কথাগুলো যদি বারবার শোনা হয়। আমাদের এখানে একজন ভক্ত আছেন, খুব জ্ঞানী। অনেক বছর ধরে, প্রায় ১৯৮৭ সাল থেকে আমি ওনাকে জানি, বিরাট বড় পণ্ডিত, অর্থনীতিবিদ। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ছিলেন। কিছু দিন আগে দেখা হতে বললেন, উনি আমাদের কথামৃতের ক্লাশগুলো ইন্টারনেটে শোনেন। শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। কথামৃত পাঠ হচ্ছে ওই ভেবে শুনছেন। শুনে আমার খুব ভাল লাগল। অতবড় জ্ঞানী, কথামৃত উনি নিজে পড়েই বুঝতে পারবেন, তাও তিনি ক্লাশগুলো মন দিয়ে শোনেন। যখন এভাবে দিনের পর দিন শাস্ত্রের কথা, অধ্যাত্মের কথা শোনা হয়, তাতেই একটা সংসঙ্গ হয়ে যায়। সঙ্গ করতে করতে এগুলোই নূতন সংস্কার তৈরী করে দেয়।

আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীমৎ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ, ওনার মন, হৃদয় বিরাট বড় আর সত্যিই উনি জগতের কল্যাণ চান, কল্যাণ বলতে ধর্ম আর শিক্ষা এই দুটো

ক্ষেত্রে জগতের কল্যাণ। উনি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে নূতন নূতন কোর্স শুরু করলেন, বর্তমানে আঠারো থেকে কুড়িটা কোর্স চলছে। করোনার সময় ইউনিভার্সিটি বন্ধ, কিন্তু উনি অনলাইনে ক্লাশ নেওয়া চালু করে দিলেন, এইজন্য করলেন, যাতে লোকেদের কাছে এই কথাগুলো খুব সহজে পৌঁছাতে পারে। আজ দেখুন, ঘরে বসেই সবাই আমাদের সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্বগুলো শুনতে পাচ্ছেন। তা নাহলে কবে কোথায় কখন একটা ধর্মসভা হবে, কোথায় কোন আশ্রমে রবিবার সন্ধ্যায় কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হবে, আর সব সময় সব জায়গায় যাওয়াও যায় না; সব বন্ধাও এক রকম বলেন না। সেইজন্য সব রকমেরই দরকার আছে। এখন ইউটিউবে এই ক্লাশ এসে যাওয়াতে বিরাট যে সুবিধা হয়ে গেল, এটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

এই মহা সুবিধা —শাস্ত্রের সঙ্গ করা যাচ্ছে, যেটা আগে আমরা বললাম। সঙ্গ করতে করতে নূতন নূতন সংস্কার তৈরী হতে হতে এমন একটা সময় আসবে, যখন অনেক দিন সঙ্গ করতে করতে এর প্রতি আস্থা বেশি হয়ে যাবে, তখন শাস্ত্রের কথাগুলি বেশি সত্য বলে বোধ হবে। যখন বেশি সত্য বলে বোধ হবে, তখন মনে হবে, ওই পথে একটু পা দিয়ে দেখিই না। যেমনি ওই পথে পা দিলেন, এবার তিনি আস্তে আস্তে আপনাকে টানতে শুরু করবেন। এই রামকৃষ্ণ জাহাজ কোথায় নিয়ে যাবে, আমার জানা নেই, আপনি জানেন না, কেউ জানে না। এটা জানি, এই যে সংসার, সংসার বলতে যেটা বোঝায়; স্বামী, স্ত্রী, পুত্র; এই সংসার সমুদ্রের পারে তিনি নিয়ে চলে যাবেন। সেই কথাগুলো আমরা কথামৃতে পাই।

ঠাকুর একজন গৃহস্থের মত, সংসারীর মত, একজন পূজারীর মত দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে বসে আছেন। যে আসছে, তার সাথেই কথা বলছেন। থিয়েটারওয়ালা আসছে, বাচ্চা আসছে, ছোকড়ারা আসছে, মহিলারা আসছে, বৃদ্ধারা আসছে, সবার সাথে কথা বলছেন। মারোয়াড়ি ভক্তরা আসছে, পণ্ডিত আসছে, মুর্থ আসছে, সবার সাথে কথা বলছেন। আর এখন ১৮৮৩ সাল চলছে, ঠাকুরের মর্ত্যলীলা সঙ্গ হতে আর বেশি দিন বাকি নেই, প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছেন। লোকেরা খবর পাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরে একজন বড় সন্ত মহাত্মা আছেন। যাঁরা আসছেন তাঁরা সন্ত শুনই আসছেন। যাঁরা আসছেন, তাঁরা এদিকে সেদিক যে দু-চারটে ধর্মের কথা, শাস্ত্রের শুনছেন, তাই নিয়ে ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন। ঠাকুর কাউকে খেলো করছেন না, কাউকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন না, ঠাকুর এক এক করে তাদের স্তরে নেমে এসে সবার কথার উত্তর দিচ্ছেন।

এগুলোই প্রতিদিনের অনুধ্যানের বিষয়। জপধ্যান সবাইকেই একটু বেশি করতে হয়, কম করে সকাল বিকাল হাজার জপ না করলে এগোন খুব মুশকিল, পারলে দশ হাজার। জপধ্যানের সাথে সাথে যখন চিন্তন করা হয়, ধ্যান করা হয়, তখন এই লীলাচিন্তন —দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর বসে আছেন, ভক্তদের সাথে কথা বলছেন। তুলসীদাস বলছেন, যদি যেতে হয় সাধুর কাছে যাবে, সেখানে বিনা পয়সায় দুটো ভাল কথা শুনতে পাবে। বাজারে গেলে আতরের দোকানে যাবে, বিনামূল্যে কিছু সুগন্ধ পেয়ে যাবে।

আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল — ঠাকুর বসে আছেন, প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তগণ আছেন। সেখানে প্রতাপচন্দ্র হাজারা, কথামৃতে ‘হাজারা মহাশয়’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বারান্দায় বসে আছেন। হাজারা মহাশয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, হৃদয়ের সঙ্গে পরিচিতি ছিল। সেই সূত্রে বা অন্য কোন সূত্রে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। হাজারা মহাশয় কথামৃতে খুব মজার একটা চরিত্র। শাস্ত্র অল্প একটু পড়েছেন, ফলে যখনই নিজে শাস্ত্রের কথা বলেন, বেশির ভাগই ভুলভাল কথা বলেন। কিন্তু ওখানে বসে জপটা করতেন। জপ করা থেকে তাঁর অহংকার হয়ে গেছে। হাজারা তাই নিজেকে মনে করতেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের থেকেও বড়। শুধু যে হাজারার এই বোধ হত তা না, এ-জিনিস আমাদের সবারই হয়। যাই হোক, হাজারা মহাশয় ঠাকুরকে মানেন না, কথায় কথায় উড়িয়ে দেন। আরও মজার হত যখন নরেন দক্ষিণেশ্বরে

আসতেন। হাজার সঙ্গ নরেনের খুব বন্ধুত্ব ছিল। ঠাকুর এবার এই হাজারকে নিয়ে কথা বলা শুরু করছেন।

**হাজারা একটি কম নয়। যদি এখানে বড় দরগা হয়, তবে হাজারা ছোট দরগা।** (সকলের হাস্য)। দরগা হল মুসলমানদের প্রার্থনার স্থান। ঠাকুর হাজারাকে মজা করেই বলতেন, কিন্তু হাজারার বুদ্ধি এত কম যে তিনি এটাও বুঝতে পারতেন না যে, ঠাকুর তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন বা মজা করছেন। আপনাকে নিয়ে যদি কেউ ঠাট্টা করে, সে প্রিয়জন হোক, অপ্ৰিয়জন হোক, এক মুহূর্তের জন্য খেমে যেতে হয়। ঠাকুরের অশেষ কৃপায় আমি অনেক জ্ঞানীশুণী দেখেছি আর সব ক্ষেত্রের, জ্ঞানের যত ক্ষেত্র হতে পারে, সব ক্ষেত্রের জ্ঞানীদের দেখেছি। সবাই কিন্তু নিজেকে নিয়ে খুব সচেতন। আপনি যদি কোন কথা বলেন, আগে সেই কথাটা মিলিয়ে দেখবেন, প্রথমেই তর্কাতর্কিতে নামবেন না। মুখরা সব সময় প্রথমেই তর্কে নেমে যাবে। প্রথমে দেখাবে আপনি কিভাবে ভুল, দ্বিতীয় বলবে, আমার পরিস্থিতি এমন সেইজন্য আমাকে এই রকম করতে হয়। যখনই দেখছেন কেউ তর্ক করতে আসছে, আপনি যদি তাকে তখন মজা করে কিছু বলেন, কিংবা ভালবেসে যদি কিছু বলেন, তার ভালর জন্য যদি কিছু বলেন, কিছুতেই সে শোধরাবে না; তর্কে সে প্রবৃত্ত হবেই। এরা অন্ধকূপে পড়ে আছে, অন্ধকূপেই থাকবে, এরা শোনার লোক না।

ঠাকুরের ঘরের দরজার সামনে সেই সময় নবকুমার এসে দাঁড়িয়েছে। এই রকম অনেক লোক ঠাকুরের কাছে আসতেন। নবকুমার ভক্তদের দেখে চলে গেলেন। কারণ উনি ঠাকুরকে একা পেতে চান। ঠাকুর বলিতেছেন – ‘অহংকারের মূর্তি’।

বেলা সাড়ে নয়টা হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন – কলিকাতার বাটিতে ফিরিয়া যাইবেন। সেই সময় একজন বৈরাগী এসেছেন, ঠাকুরের ঘরে গান করছেন, ঠাকুর গান শুনছেন। কয়েকটা গান হয়েছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। কেদার চাটুজ্যের নাম কথামতে অনেকবার আসে, ভক্ত ছিলেন, পূর্ববঙ্গে ঢাকাতে কর্মসূত্রে থাকতেন। তখনকার দিনে নিজের নিজের জায়গায় লোকেরা নিজেদের মত করে ধর্ম সাধনা করতেন, লোকেরাও সেই সেই জায়গায় যেতেন, কারণ আগেকার দিনের লোকের মধ্যে ধর্মচেতনা ছিল। হাজারা মহাশয়ের কথা বলা হচ্ছিল, তিনি অল্প কিছু নিরাকারের কথা শুনেছেন, সাকার সাধনার কথা শুনেছেন, কোথাও মন্ত্র পেয়েছেন, সেই মন্ত্র জপ করেন। কিন্তু একেবারে যে গোছানো পরিষ্কার জ্ঞান হবে সেটা নেই। কেদার চাটুজ্যেও আগে এই রকমই ছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসার পর তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হয়। তিনি অফিসের পোশাক পরেই ঠাকুরের কাছে চলে এসেছেন। মাস্টারমশাই বলছেন – ঈশ্বরের কথা হইলেই তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যান। অতি প্রেমিক লোক। অন্তরে গোপীর ভাব।

কেদারকে দেখিয়া ঠাকুরের একেবারে শ্রীবৃন্দাবনলীলা উদ্দীপন হইয়া গেল। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া গান গাহিতেছেন। গান করতে করতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। চিত্রার্চিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কেবল চোখের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছে।

এইভাবে কথা বলতে বলতে বেলা প্রায় দু-প্রহর হয়ে গেছে। একটু বিশ্রাম করে কেদার ঠাকুর কাছে বিদায় গ্রহণ করলেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়ে যায়।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

#### অভ্যাসযোগ – দুই পথ – বিচার ও ভক্তি

তিনটে বেজে গেছে। মারোয়াড়ী ভক্তেরা মেঝেতে বসে ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন। মাস্টার, রাখাল ও অন্যান্য ভক্তরা ঘরে আছেন। বাগবাজার, বড়বাজার অঞ্চলের মারোয়াড়ী ভক্তরা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে

আসা-যাওয়া করতেন। আসলে তখন লোকেদের ফাঁকা সময় থাকতে, এখনতো কারুরই ফাঁকা সময় নেই। এখন টেলিভিশন আছে, ইন্টারনেট আছে, মোবাইল আছে, স্মার্টফোন আছে, ঘোরাঘুরি করার প্রচুর জায়গা আছে। আগেকার দিনের লোকেদের অন্য কিছু ছিল না, সেইজন্য সবাই মন্দিরে যেতেন, সাধু মহাত্মাদের কাছে যেতেন। মারোয়াড়ী ভক্তরাও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই আসতেন; এখানে মন্দির আছে, ঠাকুরের মত একজন মহাত্মা আছেন।

**মারোয়াড়ী ভক্ত-মহারাজ, উপায় কি?** আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, খুব জ্ঞানী মহারাজ। জ্ঞানী হলে যা হয়, কথাগুলো খুব সুন্দর বলতেন, আমরাও তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতাম। সব বলা হয়ে যাওয়ার পর শেষে বলতেন —‘উপায় নেই ভাই, উপায় নেই’। অতবড় জ্ঞানী কিন্তু তিনি এমনভাবে কথাটা বলতেন যে, শুনে আমাদের খুব হাসি পেয়ে যেত, ওনার ‘উপায় নেই ভাই, উপায় নেই’, এই কথা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম। ঠাকুরও কতবার উপায় নিয়ে বলছেন, এখানেও উপায়কে নিয়ে চলছে। মহারাজের বক্তব্য ছিল, আধ্যাত্মিক চেতনায় তুমি যদি জাগ্রত না হও, মুক্তির চেষ্টা যদি প্রাণপন ভাবে না কর, মুক্ত যদি না হয়ে যাও, তাহলে বাঁচার কোন উপায় নেই —এই অর্থে উনি ‘উপায় নেই ভাই, উপায় নেই’ এই কথা বলতেন।

আমরা প্রথমে দিকে যে বললাম —ঠাকুর সংসারেই আছেন, পাশে শ্রীশ্রীমা আছেন আর সংসারীদের মতই আচরণ করেছেন, তদুপরি তিনি একজন সন্ত মহাত্মা। লোকেরা ওই ভাবেই দেখছে। ঠাকুর সবার কথা শুনছেন, বলছেন তার মত করে। আমাদের এখানে একজন মহারাজ আছেন, কম্পিউটারের লোক, খুব জ্ঞানী। উনি একদিন কথায় কথায় বলছিলেন —বক্তা দুই রকমের হয়। প্রথম ধরণের বক্তা বলে চলে যাবেন, দ্বিতীয় জন আপনার মাথায় ঢুকিয়ে ছাড়বেন। আমি তখন ওনাকে বললাম, প্রথমজন হলেন ওরেটর, ওরেটর হলেন যিনি আপনাকে কনভিন্স করে ছাড়বেন যে, উনি যা বলছেন সেটা ঠিক। দ্বিতীয়জন হলেন শিক্ষক বা আচার্য, এনারা আপনাকে খুলে, বিস্তারে গিয়ে পাঁচ রকম ভাবে বলবেন। এরপর আপনার যেমন ক্ষমতা, সেইভাবে আপনি গ্রহণ করবেন। জগতে দুজনেরই দরকার। যিনি ওরেটর, লেকচারার, তাঁকেও দরকার পড়ে; যাঁরা টিচার্স, তাঁকেও দরকার। ঠাকুর আচার্য, ঠাকুর ওরেটর নন। কেশবচন্দ্র সেন ওরেটর, কেশবচন্দ্র সেনের বক্তব্য —এটাই ঠিক, এটাই তোমাকে মানতে হবে। স্বামীজী আচার্য, স্বামীজী ওরেটর নন। যার জন্য যখন তিনি বুঝতেন কেউ ওনার কথায় প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছে, তাকে তিনি আটকে দিতেন। যিনি ভাল আচার্য, তিনি কখনই তাঁর শ্রোতার যে পার্সোনালিটি, সেটা তাঁর মত হতে দেবেন না, আটকে দেবেন। তুমি তোমার মত বড় হও, আমি আমার মত বড় হব। ঠাকুর যখনই কিছু বলেন, তা সে থিয়েটারওয়ালাকেই হোক, কি মারোয়াড়ী ভক্তকেই হোক, কি নরেন হোক, তত্ত্ব তাঁর মতন করে বলছেন, যাতে তিনি ওটা গ্রহণ করতে পারেন।

মারোয়াড়ী ভক্তরা আগেও, এবং এখনও প্রচুর সাধুসঙ্গ করেন। হিমালয়ের ওদিকে আছে কালী কমলীওয়ালারা, এনাদের ওদিকে অনেক খুব সুন্দর সুন্দর ধর্মশালা আছে। মাঝে মাঝে সাধুদের খুব সুন্দর খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, সঙ্গে অনেক কিছু দানও করেন। কলকাতায় যত মারোয়াড়ী আছেন, তাঁরাই এসব ধর্মশালাগুলো চালায়, সব ব্যবস্থা এনারাই করেন। ঠাকুর জানেন, এই মারোয়াড়ী ভক্তরা কেউ শাস্ত্রজ্ঞ নন, আর একেবারেই যে কিছু জানেন না, তাও না। ঠাকুরও তাঁদের মত করে বলছেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ-দুইরকম আছে। বিচারপথ-আর অনুরাগ বা ভক্তির পথ।** ঠাকুর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা মারোয়াড়ী ভক্তদের মত করে বলছেন —বিচারপথ আর অনুরাগের পথ। প্রথমে দিকে সবটাই লাগে। ধর্মপথে আমরা প্রথম পা ফেলেছি, আমাদের সবটাই লাগবে। একটু বিচার করতে হয়, একটু কর্মও করতে হয়, আর একটু ভক্তিও করতে হয়। কিন্তু যেমন যেমন এগোতে শুরু হয়, পিরামিডের যত উপরে যেতে শুরু হয়, তখন আস্তে আস্তে সব এক হতে শুরু হয়, তারপর একটা পয়েন্টে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। অনেক পথ যখন এগিয়ে যায়, তখন আর পাঁচটা জিনিসকে নেয় না।

একটা মহাকাশযান যখন মহাকাশে যায়, তখন তার অনেক কিছু থাকে। উপরে উঠতে উঠতে একটু করে ঠেলে যাচ্ছে আর কিছু কিছু জিনিস পড়ে যাচ্ছে, যত এগোচ্ছে তত পড়ে যাচ্ছে, শেষে শুধু মূল জিনিসটা থেকে যায়।

**সৎ-অসৎ বিচার। একমাত্র সৎ বা নিত্যবস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অসৎ বা অনিত্য। বাজিকরই সত্য, ভেলকি মিথ্যা। এইটি বিচার।** আমি মজা করে বলি, যদিও মজা করে বলি কিন্তু জিনিসটা খুবই সিরিয়াস। আমার এই কলমটার দাম দশ কি পনের টাকা হবে। বাজারে এই কলম কিনতে গেলে যদি দোকানদার এই পেনটার দশ হাজার টাকা দাম চায়; আপনি কি এই পেন কিনবেন? কখনই কিনবেন না, আপনি বলবেন, ‘আমাকে কি বোকা পেয়েছ’? যদি দশ টাকা দাম বলে? আপনি নিয়ে নেবেন। দরকার থাকলে নেবেন, আপনি নাও নিতে পারেন। অনেক সময় দরকার না থাকলে সখ করে নিতে পারেন, কারণ দশটা টাকা খরচ করা যায়। আর দশ হাজার দাম বললে? পেনের দরকার থাকলেও আপনি নেবেন না, বলবেন, আমি অন্য দোকানে যাচ্ছি। এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, মানুষ, ঈশ্বর, বস্তু যাবতীয় যা কিছু আছে, সবটাই কিন্তু অবজেক্ট। আর প্রত্যেকটা অবজেক্টের সাথে একটা প্রাইস ট্যাগ দেওয়া আছে। কলমের একটা প্রাইস ট্যাগ আছে, বইয়ের একটা প্রাইস ট্যাগ দেওয়া আছে। ঠিক তেমনি একজন যে মানুষ, তার সঙ্গে যে সম্পর্ক হবে, সেই সম্পর্কের সাথে একটা প্রাইস ট্যাগ লাগানো আছে।

অনেক আগে, আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে আমার এক পুরনো ছাত্রের বিয়ের কথা চলছিল। ভালবেসে আমাকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করছে, ‘মহারাজ, আপনি তো বিয়ে করলেন না, সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, কেন’? আমি হেসে বললাম, ‘বিবাহের বিরোধী আমি নই। ওখানে যে মূল্যটা দেওয়া আছে, ওই মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, আমি ওটা পেতে পারি না। সবার জীবনে বাবা-মা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে থাকতে গেলে যে মূল্য চোকাতে হয়, ওটার জন্য আমি রাজী নয়’। এটাই বলছেন বিচার।

বস্তুবিচার করে যখন জিনিসগুলিকে ফেলে দেওয়া হয়, তখন কিভাবে আমরা বিচার করব? বিচার করার অনেকগুলো উপায় আছে, শুধু যে একটি উপায়ই আছে, তা না। এই যে বলা হল—সব কিছুকে অবজেক্টিফাই করে দেওয়া, ঈশ্বরকে অবজেক্টিফাই করে দিন। আমি যদি ঈশ্বরের দিকে যাই, তাহলে আমাকে এই মূল্য দিতে হবে। মূল্যটা কি? সমস্ত কিছুর ত্যাগ, সব ফেলে দিতে হবে। লোকেরা বলে, আমি ওই মূল্য দিতে রাজী নই। দেবেন না, কোন দরকার নেই। কিন্তু যেদিন আপনার সেই পরিস্থিতি আসবে, সেদিন বলবেন, আমি ঈশ্বরের জন্য সব কিছু ছেড়ে দিতে রাজী আছি। কবীর দাস কি সুন্দর বলছেন—যে নিজের বাড়িতে আঙুন লাগাতে রাজী, চলুক সে আমার সাথে ঈশ্বরের পথে। আপনি কি রাজী? রাজী না হলে, ভুলে যান। সৎ-অসৎ বিচার এটাই—ঈশ্বরই বস্তু, বাকি সব অবস্তু। ঈশ্বরের জন্য যেমন সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দিতে হয়, তার ফল হল ভক্তি, সব কিছু থেকে ফ্রীডম। ঈশোপনিষদে বলছেন, এই দুটো পথ যদি তুমি না নাও, তাহলে *অসূর্যা নাম তে লোকা অঙ্কন তমসাব্রতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্ত্বনো জনাঃ।।* এই পথ যদি তুমি না নাও, জ্ঞান যদি না লাভ করতে পার, তাহলে তুমি আত্মহস্তা হবে, নিজেই নিজেকে বধ করছ। কারণ আত্মজ্ঞান যতদিন তোমার না হবে, ততদিন তুমি বিভিন্ন লোকে যাবে, সেখানে জন্ম নিয়ে দেহধারণ করবে আর সেই দেহেরও পতন হবে। এর জন্য দায়ী তুমি, killer of yourself।

**বিবেক আর বৈরাগ্য। এই সৎ-অসৎ বিচারের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি।** যোগশাস্ত্রে পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনের কথা যখন হয়, তখন বলে—*প্রকাশক্রিয়াস্ফিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্বকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।* এই যে প্রকৃতি, এই প্রকৃতি হল ভোগ আর মুক্তির বা অপবর্গের জন্য। কিন্তু আমাদের কি হয়, আমরা ভোগে এমন ডুবে যাই, ঠাকুর বলছেন—উট কাঁটা ঘাস খায়, মুখ

দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ে, কিন্তু কাঁটা ঘাস খাওয়া ছাড়ে না। বিচার করতে হয়, আরেকটা জন্ম যদি হয় আবার এই কাঁটা ঘাস খাওয়া দিয়েই শুরু করতে হবে। আমি আমার ক্রতু বইতে এটাই দেখিয়েছি। ক্রতুর জন্মজন্মান্তরের স্মৃতিগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটা জন্ম হয়েছে, আতঙ্কে কাঁদছে, হে ভগবান আবার আর-একটা জন্ম, আবার এই ভদ্রমহিলাকে আমায় মা বলে ডাকতে হবে?

ঠাকুর বলছেন—এটি একবারে হয় না—রোজ অভ্যাস করতে হয়। এখানেই মানুষ পড়ে যায়। একবার শুনে নিয়ে মানুষ মনে করে, ও আমি বুঝে ফেলেছি। ঠাকুরকে একজন বলছেন, ও আমি বুঝেছি। ঠাকুর শুনে খুব বিরক্ত হয়ে আগেই বলে দিয়েছেন, শুধু জানলে হবে না, ধারণা করতে হয়। ধারণা করার জন্য নিত্য অভ্যাস করতে হয়। গীতাতে বলছেন, *অভ্যাসযোগযুক্তেন*, অভ্যাসটাই যোগ, দিনের পর দিন অভ্যাস করে যাওয়া—এটাই যোগ। লেগে থাকা, বারবার বিচার করতে হবে। আচার্য শঙ্করও বলছেন—*ইতি পরিভাবয় বারংবারং*, স্বপ্নকে যেমন বিচার করি, এগুলোও সব স্বপ্নের মত, এই বিচার কর, অবজেক্টিফাই করে সব ত্যাগ কর। সব অনিত্য বলে সব কিছু ত্যাগ কর। ঋষিরা আমাদের যে ধর্ম দিয়ে গেছেন, সেই ধর্মের এই একটিই কথা—ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ; ত্যাগ ছাড়া অন্য কিছু নেই। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে এইজন্যই বিশেষণ দিচ্ছেন, তোমাদের ঠাকুর ছিলেন ত্যাগের বাদশা। কর্মত্যাগ খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী যাঁরা, তাঁদের জন্য। কিন্তু বাকিদের জন্য হল কর্মফলত্যাগ। যতটা ত্যাগ করা যায়, ততটাই কর, মোদা কথা ত্যাগ করাটা শুরু করে দাও।

ত্যাগ শুরু করার অনেক উপায় আছে, জীবনটাকে খুব সহজ করে নেওয়া। দ্বিতীয় সবটাই ঈশ্বরের পূজা। যে বাড়িতে আছি, এটা ঈশ্বরের মন্দির। বাড়িতে যে রান্নাবান্না হচ্ছে, এটা ঈশ্বরের ভোগ। এই ভোগ আমিও গ্রহণ করব, আরও চারজনকে প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ করে দেব। শ্রীশ্রীমা একদিন বিরক্ত হয়ে বলছেন, ঠাকুর যখন ছিল তখন কেউ দেখল না, এখন খুব আয়োজন করে ভোগ নিবেদন করছে, কারণ নিজেরা খাবে বলে। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর তিথিপূজার দিন বাড়িতে ভাল করে উৎসব করুন। নিজে ঝোলভাত খাবেন, বাকি ভাল যা কিছু বানিয়ে ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে নিবেদন করুন, পরে সব পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রসাদ রূপে খাওয়ান। এটাই অনাসক্তি, এটাই নিষ্কাম কর্ম, এটাই পূজা। আমরা উল্টোটা করি, নিজেদের জন্য ভাল ভাল জিনিসগুলো রেখে দিই।

কামিনী-কাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয়।—তারপর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও করতে হয়, বাহিরের ত্যাগও করতে হয়। কলকাতার লোকদের বলবার জো নাই ‘ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর।’—বলতে হয় ‘মনে ত্যাগ কর’। ঠাকুর কৃপাসিদ্ধ, তিনি জানেন লোকেরা ত্যাগ করতে পারবে না। ত্যাগ করার ইচ্ছেই হবে না, যদি ইচ্ছেও করে কিন্তু পেরে উঠবে না। আমাদের খুব প্রাচীন নামকরা সাধু ছিলেন, শ্রীমৎ স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ, উনি কিছু কিছু বইও রচনা করে গেছেন। আমি তখন সবে মঠে জয়েন করেছিলাম, বয়স তখন মাত্র একুশ-বাইশ। মহারাজ তখন থেকে আমাকে খুব স্নেহ করতেন। দেহত্যাগের আগে পর্যন্ত উনি আমাকে মনে রেখেছিলেন। কখন সখন গেলে খুব খুশি হতেন। একবার কথায় কথায় তিনি বিশ্বামিত্রের গল্প বলছিলেন। বলার পর আমাকে বলছেন, ‘দেখ কিভাবে বিশ্বামিত্রের মত ঋষির পতন হয়ে গেল’। একটু পরে আবার বলছেন— ‘এই কাহিনীগুলো আক্ষরিক ভাবে সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু এই কাহিনীগুলোর মাধ্যমে দেখানো হয়, সবাইকে কত সাবধান থাকতে হয়’। বিশ্বামিত্র, তিনি এত তপস্যা করলেন, এত তপস্যা যে, সেই তপস্যার জোরে তিনি আলাদা একটা স্বর্গ দাঁড় করিয়ে দিলেন। এখনও পদার্থ বিজ্ঞানীরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, প্যারালাল ইউনিভার্স বলে কিছু হয় কিনা। আর আমাদের বিশ্বামিত্র প্যারালাল স্বর্গ দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইন্দ্র বলে দিয়েছিলেন, ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রকে ধরলেন, ধরে বললেন, প্রভু কৃপা করুন, আমি স্বর্গে যাবই যাব। বিশ্বামিত্র নিজের তপস্যার জোরে একটা প্যারালাল স্বর্গ দাঁড় করিয়ে দিয়ে ত্রিশঙ্কুকে বললেন, এই নাও স্বর্গ। ত্রিশঙ্কু এখন স্বর্গেও নেই, পৃথিবীতেও নেই, একটা প্যারালাল ইউনিভার্স দাঁড় করিয়ে দিলেন। অত বড় ক্ষমতাবান তপস্বী তেজস্বী ঋষি বিশ্বামিত্র কিনা

শেষে একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে গেলেন? ওই মেয়ের খপ্পড় থেকে তিনি বেরোতে পারলেন না। এর আক্ষরিক সত্য আমি জানি না। ‘মেয়ের পাল্লায়’ এই শব্দে অনেকের আপত্তি হতে পারে, কিন্তু পুরুষের জন্য নারী হল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়।

ঠাকুর এটাই বলছেন, কলকাতার লোকেদের বলবার জো নাই ‘ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর’। কারণ সাধারণদের পক্ষে ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ করা সম্ভব না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, মনে ত্যাগ কর। তাতে কি হয়, লোকেরা যে এগুলো ভোগ করবে, ভোগ করার পর ঠাকুরের কথা দিয়ে বলবে, ‘আমার তো মনে ত্যাগ করা আছে’। আসলে এগুলো ধাপ্লাবাজী, এর বেশি কিছু না। মনের ত্যাগ, বহির্ত্যাগ দুটোই করতে হয়। ঠাকুরই বা কি করবেন, কিছু তো উৎসাহ দিতে হবে। আমার মনে আছে, বাচ্চা বয়সে প্রথম ‘অ’ ‘আ’ ‘ক’ ‘খ’ লেখা শিখছি। প্রথমে বহু কশরৎ করে ‘অ’ লেখা শিখেছি। একটা ‘অ’ লিখতে পেরে আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে, মনে হচ্ছিল আমি সমস্ত জ্ঞান পেয়ে গেছি। বারবার বড়দের গিয়ে দেখাচ্ছি, ‘কি দারুণ লেখা হয়েছে না’! সবাই আর কি বলবেন, বাঃ খুব ভাল হয়েছে। একজন শুধু বললেন, ‘পরেরটাও লেখ তারপর দেখি’। এই আর কি। বড়রা একটু উৎসাহ দিয়ে বলেন, বাঃ সুন্দর হয়েছে।

অভ্যাসযোগের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ-কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে, তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে—কাম, ক্রোধ বশ করতে কষ্ট হয় না। যদিও সরাসরি যোগ নেই, তাও এখানে দুটো কথা বলা যেতে পারে। ধ্যান যদি করা হয়, দিনে যদি তিন থেকে চার ঘণ্টা ধ্যান করেন, ঠিক তেমনি দিনে যদি তিন থেকে চার ঘণ্টা জপ করা হয়; একবারে না পারলে, তিনবারে কি চারবারে করলেন, সাথে সাথে ত্যাগের অভ্যাস করতে থাকলেন, এতে মন খুব পাওয়ারফুল হয়ে ওঠে, মনের শক্তি বাড়বেই বাড়বে। এই যে বৈজ্ঞানিকরা আজ এত উচ্চতায় পৌঁছালেন, অভ্যাস আছে বলে। আর ধর্মজীবনে অভ্যাস হল লেগে থাকা। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলছেন—স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ। স তু—মানে ওই জিনিসটা, মানে অভ্যাসটা, দীর্ঘকাল—অনেকদিন করে, নৈরন্তর্য—নিরন্তর, একটুও ছাড় দেওয়া চলবে না, আজ একটু করলাম কাল করলাম না, তা না; এভাবে করলে কিছু হবে না। সৎকারাসেবিতো—খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে শুধু এটাকেই অভ্যাস করে যেতে হবে। ঠাকুর এখানে বলছেন, অভ্যাসের দ্বারা বিরাট শক্তি আসে।

কি রকম শক্তি? আপনার মন লোহার মত, আর কামিনী-কাঞ্চন চুম্বকের মত। চুম্বক লোহাকে টেনে যাচ্ছে, লোহা চুম্বকের সাথে সঁটে যাচ্ছে। দরকার এদিকে আরেকটা চুম্বক, ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট যে-রকম হয়; তার দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি পাস করছে মাঝখানে লোহা আছে, ওই লোহাটাই পাওয়ারফুল ম্যাগনেট হয়ে যায়, বড় বড় ইঞ্জিন খুব পাওয়ারফুল ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট দিয়ে চলে; তারপর ইলেক্ট্রিসিটি বাড়িয়ে বাড়িয়ে লোহাকে এত পাওয়ারফুল ম্যাগনেট করে দিল যে, আপনার মন যেটা লোহার মত, চুম্বকের সাথে সঁটে আছে, সেটাকে এই ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট টেনে নিল। এই শক্তি কি আমাদের ঠাকুর দেবেন? আমাকে একজন বলল, ‘ঠাকুরের কৃপায় হবে’। শুনে আমি খুব রেগে গেলাম, সব ফাঁকিবাজ ভক্ত। ঠাকুর এসে কি তোমায় বলেছেন, ‘আমার কৃপায় হবে? যেদিন ঠাকুর প্রত্যক্ষ এসে তোমায় বলবে, আমার কৃপাতেই হবে, আমার ইচ্ছাতে জগৎ নড়ছে, সেদিন আমাকে এসে বলবেন, এখন আসুন’। এই চেষ্টাটা হয় অভ্যাস দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা যে শক্তি বাড়ে, ওই শক্তিই কামিনী-কাঞ্চন রূপ চুম্বক থেকে টেনে সরিয়ে আনে।

যেমন কচ্ছপ হাত-পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড়ুল দিয়ে চারখানা করে কাটলেও আর বাহির করে না। গীতাতেও আমরা একই বর্ণনা পাই—যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ। বিচার নিয়ে ঠাকুর বলে যাচ্ছেন, কারণ বিচারপথ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মারোয়াদী ভক্ত – মহারাজ, দুই পথ বললেন; আর-এক পথ কি?



শ্রীরামকৃষ্ণ – অনুরাগের বা ভক্তির পথ। ব্যাকুল হয়ে একবার কাঁদ –নির্জনে, গোপনে – দেখা দাও বলে।

ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।

আসলে ভক্তিপথ আর জ্ঞানপথ এই দুটো পথ। বিচারপথ আর জ্ঞানপথ আলাদা কিছু না। দুটোই এক, সংসারের আকর্ষণ, জগতের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে হয়। জ্ঞানপথে চেষ্টা করে ত্যাগ করতে হয়, আর ভক্তিপথে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে ত্যাগ করার শক্তি অর্জন করতে হয়। ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে যখন প্রার্থনা করা হয়, তখনও একই জিনিস হচ্ছে –মনের জোড় বৃদ্ধি পায়; একই জিনিস, সাধনাতে আসলে কোন তফাৎ নেই।

মারোয়াড়ী ভক্ত – মহারাজ সাকারপূজার মানে কে? আর নিরাকার, নির্গুণ –এর মানেই বা কি? অতদূর থেকে এসেছেন মনের কিছু জিজ্ঞাসাও আছে, তার সঙ্গে এই শব্দগুলো শুনেছেন, সেখান থেকেও অনেক প্রশ্ন আসছে। ঠাকুর সাকারপূজার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়। সাকারপূজার গুরুত্ব সব সময় অনস্বীকার্য। বর্তমানকালে ইন্টারনেটাদি হয়ে গেছে, সেখানে কিছু দুষ্ট লোক, বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা হিন্দুদের নামে নিন্দা করতে নেমে যায়। কিন্তু সাকারপূজা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাঁর ভাব আপনি পেতে চান, আপনাকে তাঁর ছবি লাগিয়ে রাখতে হবে। ঠাকুরের ভক্তরা তাই ঘরের দেওয়ালে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ছবি টাঙান। আপনি যাঁকে শ্রদ্ধা করেন, আপনার গুরু যিনি, তাঁদের ছবি লাগিয়ে রাখলে কি হয়? প্রথমে তো এগুলো ছবি, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ভাব আরোপ হতে শুরু হয়, সেখান থেকে উদ্দীপন, তারপর সেখান থেকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সাকাররূপ কিরকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি ওঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক-একটি রূপ উঠছে দেখা যায়। অবতারও একটি রূপ। অবতারলীলা সে আদ্যাশক্তিরই খেলা। এর উপর আমরা আগে আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি। ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। বেদের নাসদীয় সূক্ত খুব নামকরা সূক্ত, সেখানে বলছেন, *অনিদ্বাতম্ স্বধয়া ত্বমেকম্*, নিজের স্বরূপে তিনি অবস্থিত, তাঁর যে শক্তি, সেই শক্তিকে তিনি নিজের ভিতরেই ধারণ করে আছেন, কোথাও আলাদা কিছু নেই। কিন্তু পরে তাঁর যখন ইচ্ছা হল, আমি এক আমি বল্ হবো, শাস্ত্রে আবার এটাকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; তিনি তখন নিজেকে আলাদা করে ফেলেন। তিনি যে শক্তিমান, তাঁর ভিতরের সেই শক্তিটা তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে পরিষ্কার আলাদা হয়ে গেল। এবার শক্তি আর শক্তিমানের খেলা শুরু হয়ে গেল। এটাকেই কেউ বলছেন, শিব-শক্তির খেলা। সেই শিব এখন শক্তির মাধ্যমে আমাদের সামনে আসবেন, আমরা যাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারব, যাঁকে আমরা ধ্যান করতে পারি, যাঁর পূজা করতে পারি। সেই যে শিব যিনি শক্তির পারে, তাঁকে কোন দিন দেখা যায় না, তাঁর কোন দিন পূজা হয় না, তাঁর কোন দিন পূজা করা যায় না। ঠাকুর এখানে জল আর জলের ভুড়ভুড়ি ওঠার কথা বলছেন, স্বামীজী সমুদ্র আর তার চেউএর কথা বলছেন, দুটো একই জিনিস। সমুদ্রের এক একটা চেউ যেন এক একটা অবতার, সঙ্গে অনেক কিছুকে নিয়ে তিনি চলছেন। কিন্তু সেটা হল শক্তির এলাকা।

পাণ্ডিত্যে কি আছে? ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। নানা বিষয় জানবার দরকার নাই। এই কথাগুলো ঠাকুর কিছুটা মারোয়াড়ী ভক্তের জন্য বলছেন, কিছুটা নিজের মত বলে যাচ্ছেন।

যিনি আচার্য তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। বলা মুশকিল, এই কথাগুলো ঠাকুর সরাসরি ওনাদের বলতে চাইছেন, নাকি মাঝখানে আর কিছু কথা বলেছিলেন, যেটা মাস্টারমশাই হয়ত নোট করেননি বা

তিনি নিজে থেকেই বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছেন। **অপরকে বধ করবার জন্য ঢাল-তরোয়াল চাই; আপনাকে বধ করবার জন্য একটু ছুঁচ বা নরুন হলেই হয়।**

আমি যে মহারাজের কাছে অনেক কিছু শিখেছি, শ্রীমৎ স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ, বিরাট পণ্ডিত লোক ছিলেন। পতঞ্জলি ব্যাকরণের মহাভাষ্য ওনার পুরো মুখস্ত ছিল। আমি নিজে দেখেছি, শ্রীমৎ স্বামী গস্তীরানন্দজী আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন, উনি সেই সময় মধুসূদন সরস্বতীর গীতার অনুবাদ করছিলেন, হঠাৎ একদিন উনি রাম মহারাজের কথা জিজ্ঞেস করছেন, উনি আছেন কিনা। রাম মহারাজ প্রণামে যেতেন। সেদিনও গেছেন, মোক্ষদা মহারাজকে দেখে উনি জিজ্ঞেস করছেন, ‘আচ্ছা এই শব্দের কি অর্থ হয় তোমার মনে আছে?’ রাম মহারাজ পতঞ্জলি ভাষ্য থেকে গড়গড় করে বলতে থাকলেন। সংস্কৃতের তো পণ্ডিত ছিলেনই, তার বাইরে তিনি হিন্দি, বাংলা, ইংরাজী তার সাথে ফরাসী ভাষাও ভাল জানতেন; এত বড় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোন দিন লাইমলাইটে আসেননি। ওনার জীবনের শেষ পনের-কুড়ি বছরে ওনাকে কোন বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে সব সময় উনি এটাই বলতেন —এখন একটা ছুঁচ বা নরুন হলেই হয়।

এই হল সাধু আর পণ্ডিতের তফাৎ। পণ্ডিত নিজের পাণ্ডিত্যকে ধরে রাখতে চায়। কারণ তিনি জানেন, আমার পাণ্ডিত্য যদি চলে যায়, আমার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। রাম মহারাজকে একবার বলতে শুনেছিলাম, কোন একটা কথা বলতে গিয়ে তাঁর কোন একটা কথা মনে পড়ছিল না, স্মৃতি তখন ঠিক ঠিক কাজ করছিল না। এটা অবশ্য তাঁর জীবনের একেবারে শেষের দিকে; উনি হঠাৎ বলছেন, ‘সব ভুলে যাচ্ছি’। আগে হলে ফট ফট করে সব বলে দিতেন। তারপরেই বলছেন, ‘আর ভুলে গেলেই বা কি, কাজ তো হয়ে গেছে’। শাস্ত্রের কাজ এই একটাই —ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাওয়া। তবে প্রথমে দিকে শাস্ত্রের প্রয়োজন লাগে, প্রথমে দিকে শাস্ত্র না জানলে এটা হবে না।

আমি কে, এইটি খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। বিচারপথে খুব গভীরে যদি যাওয়া যায়, প্রচুর গভীরে চলে গেলে তাঁকে পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা —না মন, না বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে, আমি এ-সব কিছুই নয়। ‘নেতি’ ‘নেতি’। আত্মা ধরবার ছোঁবার জো নাই। তিনি নিঃশব্দ-নিরূপাধি। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্*। আমি এটা নয়, আমি সেটা নয়; এই যে বিচার, এটাই জ্ঞানপথ।

কিন্তু ভক্তি মতে তিনি সগুণ। চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম—সব চিন্ময়। সমস্ত কিছুই চিন্ময়, ত্যাগের কিছু নেই। এই কলম, এটাও সেই ঈশ্বরেরই উপাধি, ঈশ্বরেরই প্রকাশ।

**মারোয়াদী ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।**

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। ১লা জানুয়ারি ছিল, মাস্টারমশাই সারাদিন ছিলেন। ভক্তেরা সবাই বিদায় গ্রহণ করেছেন। মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন। ঠাকুরবাড়িতে এইবার আরতি হইতেছে। বলছেন, জোয়ার আসিয়াছে—ভাগীরথী কুলকুল শব্দ করিয়া উত্তরবাহিনী হইতেছেন। আরতির মধুর শব্দ কুলকুল শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও মধুর হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে প্রেমোন্মত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। সকলই মধুর! হৃদয় মধুময়! মধু, মধু, মধু!

মাস্টারমশাই ঠাকুরের সঙ্গে আছেন, শ্রীমুখ-নিঃসৃত উচ্চমানের কথাগুলো শুনছেন। ইতিমধ্যে ওনার একটা প্রস্তুতি হয়ে গেছে। প্রস্তুতি না হলে তো এগুলো ধারণা করা যায় না। এই জায়গাতে ওনার চেতনার স্তর একটু উপরের দিকে চলে গেছে, সেখানে তিনি সব কিছু আনন্দময় দেখেছেন, সব কিছু মধুময় অনুভব করছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়ে যায়।

## কথামৃত - নবম পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita  
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math  
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

বেলঘরে গ্রামে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ  
নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে

প্রথম পরিচ্ছেদ

এতক্ষণ আমরা কথামৃতের ১লা জানুয়ারী ১৮৮৩ সালের বর্ণনা করছিলাম। এরপর প্রায় দেড় মাস পর ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ সালের বর্ণনা পাই (পৃঃ১৩৮)। এই দেড় মাসের কথা ভাবলে আমাদের এই কথাই মনে হয়, ঠাকুরের কত কথা চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে। সেইজন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন ঠাকুরের সন্তানদের যাঁকে যেমন ঠাকুর বলেছিলেন, সব কথাগুলোকে যদি এক জায়গায় করা যেত। ঠিক সেভাবে ধারাবাহিক ভাবে কিছু হয়নি, তবে স্মৃতিচারণ হিসাবে অনেক কিছু পাওয়া গেছে।

ঠাকুর বেলঘরে গ্রামে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসেছেন। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের ভক্ত, তাঁর নাম আরও অনেক জায়গায় এসেছে। মাস্টারমশাই বলছেন – নরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি ভক্তরা আসিয়াছেন, প্রতিবেশিগণ আসিয়াছেন। ৭/৮টার সময় প্রথমেই ঠাকুর নরেন্দ্রাদিসঙ্গে সংকীর্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে লোকেদের মুখে মুখে ঠাকুরের কিছু কিছু নাম ছড়িয়েছে, মূলতঃ কেশবচন্দ্র সেনের জন্য; তার থেকেও বড় হল, ভারতে একটা সনাতন পরম্পরা আছে যে, সাধু ও সাধুপুরুষদের দেখলে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে হয়। বড়দের তো অবশ্যই, কিন্তু যদি জানা যায় ইনি একজন সাধু বা সাধুপুরুষ, সেখানে বড় ছোটর কোন ব্যাপার নেই, সাধুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করা চাই। এখন হতে পারে ইনি সাধুপুরুষ, কিংবা কেশবচন্দ্র সেনের ওখানে ওনার নাম শুনেছেন, সেই কারণে কীর্তনান্তে অনেকেই ঠাকুরকে প্রণাম করছেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, ‘ঈশ্বরকে প্রণাম কর’। আবার বলিতেছেন, ‘তিনিই সব হয়েছেন, তবে এক-এক জায়গায় বেশি প্রকাশ, যেমন সাধুতে। যদি বল, দুষ্ট লোক তো আছে, বাঘ সিংহও আছে; তা বাঘনারায়ণকে আলিঙ্গন করার দরকার নাই, দূর থেকে প্রণাম করে চলে যেতে হয়। আবার দেখ জল, কোন জল খাওয়া যায় কোন জলে পূজা করা যায়, কোন জলে নাওয়া যায়। আবার কোন জলে কেবল আচান-শোচান হয়’। এই কথাগুলো ঠাকুর আগে আগে বলেছেন, সেখানে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি।

আমাদের প্রাচীন যে শাস্ত্রগুলি আছে, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্রাদি যত শাস্ত্র আছে, সমস্ত শাস্ত্রের প্রণেতা যাঁরা, সেই ঋষি, মুনিরা শাস্ত্রগুলিকে একটা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দিয়েছেন। এটা করে তাঁরা যে ওটাকে সীমিত করে দিয়েছেন, তা না, তাঁর scope নেই। আচার্য শঙ্কর যখন গীতার ভাষ্য রচনা করছেন, তখন তাঁর জন্য একটা সীমা বাধা আছে, সীমার বাইরে তিনি কক্ষণ চলে যেতে পারবেন না। এটা যে শুধু আচার্য শঙ্করের জন্য হচ্ছে তা না, সবারই জন্য সীমা বাধা। যখন একটা মাত্র বিষয়কে নিয়ে করা হয়, অনেক কিছু তখন হারিয়ে যায়। বেদান্ত খুব সহজ ভাবে বলে দিলেন, ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। আমরা যে বহু দেখছি, এটা আমাদের দৃষ্টির দোষ, মনের দোষ—এটাই মায়া। অন্য দিকে যাঁরা শক্তি মতে চলেন, তাঁরা সব কিছুকে শক্তির প্রকাশ রূপে দেখেন। তাহলে কি বেদান্ত মত আর শাক্ত মত আলাদা? একেবারেই আলাদা না, দুটো একই জিনিস। আচার্য শঙ্করও বলছেন, শক্তি ও শক্তিমান এক। যেখানে শক্তির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, তার মানে শক্তিমান একজন আছেন। যাঁর শক্তি আর শক্তির প্রকাশ, দু-জনই এক; এটা ঈশ্বরেরই শক্তি।

ঠাকুরের কথামৃতকে নিয়ে কেউ যদি একটা দর্শনশাস্ত্র লেখেন, তখন দেখা যাবে জিনিসটা সীমিত হয়ে গেছে, সীমিত হতে বাধ্য। চার্চ আদির ঠিক এই সমস্যাটাই হয়। ওনাদের প্রফেটরা যখন ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় শক্তিকে যখন ব্যাখ্যা করতে যান, সীমিত করে ফেলেন। কথামৃতের ব্যাখ্যা আমি করছি, তার সাথে অনেক মহারাজরাই করেন, প্রত্যেকেই নিজের মত ব্যাখ্যা করবেন। ঠাকুরের এখানে দুটোই আছে—ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, এটাও আছে; আর এই জগতে সব কিছু শক্তির প্রকাশ, এটাও আছে। নামরূপ উড়ে যায়, তার মানে সবই মায়া—এটাও আছে। তফাৎ হল, বাকিরা অনেক সময় মুখের কথা বলতে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর এখানে যেমনটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনটি বলছেন।

**প্রতিবেশী—আজ্ঞা, বেদান্তমত কিরূপ?** এই ধরণের প্রশ্নগুলি শুনতে ভাল লাগে। তখনকার দিনে এখনকার মত এত গ্রন্থাদি পাওয়া যেত না, কিন্তু তখনও এনারা জানতেন বেদান্তমত বলে একটা কিছু আছে। কারণ সেই সময় বেদান্ত শুধু সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে কিছু কিছু উপনিষদ বাংলাতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ষড়্দর্শন, বেদান্ত আদি শাস্ত্র পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষ বেদান্তমত সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, শুনে ভাল লাগে, কোথাও হিন্দুরা নিজের জ্ঞানরাশির ব্যাপারে সজাগ ছিলেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ – বেদান্তবাদীরা বলে ‘সোহহম’ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; আমিও মিথ্যা। কেবল সেই পরব্রহ্মই আছেন।** এটাকে নিয়ে আমরা এতবার আলোচনা করেছি যে, আবার বলতে গেলে সবাই বলবে, বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন। হৃদয়রামও ঠাকুরকে বলেছিলেন—মামা, তুমি একই কথা বারবার বল কেন? এই কথাগুলো একটু ধারণা করতে হয়। ধারণা করা কিন্তু অত সহজ না। বিশেষ করে যারা প্রথমবার, দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার শুনছেন, তাঁদের পক্ষে ধারণা করা একটু মুশকিল আছে।

এর সহজ উপমা হল, সোনা আর সোনার গয়না। সোনা দেখলে গয়না চোখে পড়ে না। কিছু দিন আগে একজন আমাকে একটা ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছিলেন, পাঠিয়ে আমাকে বলছেন, ‘দেখুন এই বাবাজী কি সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন’। কোন এক বাবাজীর ভিডিও, বাবাজীর প্রচুর পপুলারিটি হয়ে গেছে। ইউটিউব, ফেসবুক, হোয়াটসাপে চারিদিকে তিনি তাঁর লেকচার ছেড়ে যাচ্ছেন। উনি ওই রকম একটা লেকচার দিতে গিয়ে বলে যাচ্ছেন, সবাই রামকে ঘরে রাখতে চায়, রাবণকে কেউ রাখতে চায় না। কিন্তু রাবণের যদি একটা সোনার মূর্তি হয়, তখন কি করবেন? শ্রোতারা হাসছে। আমি ভিডিওটা তক্ষুণি ডিলিট করে দিলাম। আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছেন? একটা ছবি যখন দেখেন, শ্রীরামচন্দ্রের ছবি, সেখানে ছবি রূপে নেওয়া হচ্ছে, তার রামের কথা মনে পড়ে। যখন সোনার কোন মূর্তি আসবে, সেখানে সোনাকে দেখা হয়, তাতে সোনার যে দাম তার আকৃতি থেকে বেশি, এটাই সকলের মনে আসবে। সোনার যে গয়নাগুলো হয়, কেউ কিনতে গেলে আগে গয়নাটাকে ওজন করতেন, তারপর মুজুরি নিয়ে গয়নার দাম বলতেন। ইদানিং সব ব্র্যাণ্ডেড হয়ে গেছে, আগে থেকেই দাম লাগানো থাকে। কিন্তু সেখানেও গয়নার ওজন নেওয়া হয়, এর মধ্যে সোনার ভাগ কত, কত ক্যারোটের সোনা, তার সঙ্গে কত ওজন। কিন্তু যিনি সাজগোজের জন্য নেবেন, তিনি সোনাকে দেখবেন না, তিনি গয়না, গয়নার ডিজাইনকে দেখবেন। অন্য দিকে যিনি বিক্রেতা, তিনি শুধু ওজনটা দেখছেন। চোর চুরি করার সময় ডিজাইন দেখবে না, ওজনটা দেখবে। কেউ যখন গয়না বিক্রি করতে যায়, তখন তারা ওটাকে ওজন রূপে নেবে। এটাই হল খুব সহজ ব্যাখ্যা।

ঈশ্বর আর তার সৃষ্টি, সৃষ্টিটা গয়নার মত। যখন সৃষ্টি রূপে নিচ্ছে তখন সৃষ্টি রূপে; যখন ঈশ্বর রূপে নিচ্ছেন, তখন সৃষ্টির কোন আকার-প্রকার থাকে না। যখন পুরো জিনিসটা এক দেখছেন, তখন তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এটাও যে বলা হয়, বোঝানর জন্যই বলা হয়। ঠাকুর বলছেন, সেই পরব্রহ্মই আছেন। এই কথাতে আমাদের প্রায়ই মনে হয়, তিনিই আছেন, সেই এক। আসলে কি আছে

মুখে বলা যায় না। অদ্বৈত কি মুখে বলা যায় না। অদ্বৈত মানে এক নয়, অদ্বৈত মানে এক-দুইয়ের পারে। তবে লোকেরা যাতে ভুল করে ওটাকে শূন্য না ভেবে বসে, সেইজন্য এ-রকম ভাবে বলা, তিনিই আছেন, সেই এক— এইভাবে বলা হয়। কিন্তু যেখানেই খুব গভীর আলোচনা হয় সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাকেও আটকে দেওয়া হয়। ঠাকুর বলছেন—কেবল সেই পরব্রহ্মই আছেন। তাহলে কি তিনি এক? কি করে বলব, কেউ তো নেই বলার জন্য। যখন তিনি একাই আছেন, তখন সেটা কি আছে মুখে বলা যায় না। আমরা এর উপর অনেকবার আলোচনা করেছি।

যাঁরা বেদান্তমতে যান, সেখানে প্রথম হচ্ছে—এই আমিটাও মিথ্যা। ঠাকুর এটাকে অন্য জায়গায় বলেছেন—হাত কেটে গেছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, বলছে, কই আমার তো কিছু হয়নি। আমি প্রথম প্রথম যখন কথামৃত পড়তাম, তখন বুঝতে পারতাম না, এই কথা দিয়ে ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। হাত কেটেছে, হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে, এটাই তো বলবে যে, আমার হাত কেটেছে; কিন্তু বলছে আমার তো কিছু হয়নি। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক বেদান্তী, তিনি দেখেন, আমি তো শুদ্ধাত্মা, আমি তো হাত নই, হাত কেটেছে হাত থেকে রক্ত পড়ছে, আমার তাতে কি হয়েছে! ঈশ্বর আছেন, আমি আছি, আর কোথাও কিছু নেই; এই যে বোধ ‘আমি আছি’, এই বোধটাই পরব্রহ্মকে জানতে দেবে না। কারণ এখানে আমিত্ব এসে গেছে, আমিত্ব এসে যাওয়া মানেই মনের দেওয়াল এসে গেছে। যখন আমি লয় হয়ে যাবে তখন সে ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যাবে। স্বামীজী সেইজন্য বলছেন—You can be one with God, but you cannot know God। কোন কিছুকে জানার জন্য আমি থাকতে হয়, কিন্তু আমি থাকলে ব্রহ্ম আসবেন না।

এগুলো ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। শাস্ত্র পড়তে থাকলে, সাধুসঙ্গ করতে করতে, জপধ্যান করতে করতে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের ভিতরে চিন্তন মনন করলে, নিজে বারবার এর উত্তর বার করার চেষ্টা করলে, তবে বোঝা যায়, তবে গিয়ে ধারণা হয়। চিন্তন-মনন করতে গিয়ে বা নিজে উত্তর বার করার চেষ্টা করতে গিয়ে যদি সেখানে কোন অঙ্কট বঙ্কট কিছু আসে, তখন সেটাকে প্রশ্ন করলে, আলোচনা করলে উত্তর পাওয়া যায়। শুধু মনে রাখবেন, অদ্বৈত বলতে এক নয়, অদ্বৈত মানেই এক দুইয়ের পারে।

কিন্তু আমি তো যায় না; তাই আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর ভক্ত— এ-অভিমান খুব ভাল। এটাও ঠাকুর আগে আগে অনেকবার বলেছেন, আমরাও এর আলোচনা বিস্তারে করেছি। ‘আমি’ যায় না। উত্তরাখণ্ডে বেদান্তের একটা সম্মান আছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ওখানে মহিলারা যান, আর সবারই একজন করে বড় বড় গুরু আছে। গুরুরা দামী দামী গাড়ি, লিমোজিন, মার্সেডিজ গাড়িতে চড়ছেন; আর থেকে থেকে খালি বলতে থাকবেন, জগৎ মিথ্যা হয়। বড়লোক ভক্ত ছাড়া সাধারণ লোকদের সাথে কথাও বলবেন না, আর এদিকে বলতে থাকবেন, সংসার মিথ্যা হয়। কিন্তু বেদান্তের বিরাট সম্মান, বেদান্ত ছাড়া সেখানে অন্য কিছু চলে না। এখানে দুটো জিনিস চলে—একটা হল spirituality, আর-একটা spiritual glamour। দুটোই পুরো বিপরীত জিনিস। ঠিক ঠিক ঈশ্বরের যে ভাব সেটা একটা জিনিস আর spiritual glamour এটা আর-একটা জিনিস। যেখানেই spiritual glamour আছে, নামযশ আছে, ভক্ত-ভক্তানি আছে, টাকা-পয়সা আছে সেখানেই বুঝে নিতে হয় যে, ইনি spiritualityর glamourএ আছেন, সেখানে spirituality নেই। কারণ spirituality এগুলোর বিপরীত।

স্বামীজীর জীবন এখানে সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত। স্বামীজী আমেরিকায় যে কাজ করলেন, তাতে স্বামীজীর নাম হল, অনেক লোক স্বামীজীকে জানতে পারলেন। আমেরিকা থেকে ফিরে ভারতের মাটিতে তিনি পা রাখলেন, কি তুমুল অভিনন্দন। কলম্বোতে নেমে পান্থন হয়ে, চেন্নাই হয়ে কলকাতায় ফিরলেন, শুধু অভিনন্দন আর অভিনন্দন। যেখানেই যান সেখানেই অভিনন্দন দিয়ে স্বামীজীকে ভাসিয়ে দেওয়া

হচ্ছে। অভিনন্দনের পালা শেষ, স্বামীজীর কাছে আর কেউ নেই। দ্বিতীয়বার বিদেশ থেকে যখন স্বামীজী ফিরে এলেন, কেউ টের পেল না যে, স্বামীজী দেশে ফিরে এসেছেন। বেলুড় মঠে তখন প্রবেশ দ্বার ছিল দক্ষিণ দিকে। এসে দেখছেন গেট বন্ধ, তিনি কোর্ট-প্যান্ট পরা অবস্থায় গেট ডিঙিয়ে ভিতরে চলে এলেন। দারোয়ানরা রাত্রে খাওয়ার সময় বলছে, এক সাহাব আয়া হ্যায়। কোথায় ছিল লোকজন, কোথায় অভিনন্দন? কারণ স্বামীজী কখনই গ্ল্যামারে ছিলেন না। উনি চাইছিলেন একটা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে, সনাতন ধর্মের সত্যকে নিয়ে আলোড়ন তুলতে হবে, তিনি আলোড়নটা তুলে দিয়ে গেলেন। ওই আলোড়নে লোকেরা ঠাকুরের কথা জানল, স্বামীজীর কথা জানল, হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য জানল। সব হয়ে গেল, উনি ওটাকেও ত্যাগ করে দিলেন।

লীলাপ্রসঙ্গে আমরা একই জিনিস পাই, ঠাকুরের দেখার ইচ্ছা হল গ্ল্যামার জিনিসটা কি। তারপর তিনি যখন কামারপুকুর গেলেন, বিরাট হৈ হৈ পড়ে গেছে। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসার পর সব কোথায় মিলিয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বরে বসে অবতার চিত্কার করে যাচ্ছেন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। কেশবচন্দ্র সেন প্রচার করলেন, বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রোম রৌলা লিখলেন, ম্যাক্সমুলার লিখলেন, তারপরেও কেউ কোথাও নেই, সব ফাঁকা। ঠাকুর যদি চাইতেন তিনি গ্ল্যামার সৃষ্টি করতে পারতেন; স্বামীজীও চাইলে করতে পারতেন, কিন্তু করলেন না। যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিকতায় আছেন, তাঁরা ওই আমিত্বটাকেও ছেড়ে দেন। একবার তো লোকজন দেখে ঠাকুর খুব রেগে গেলেন। হৃদয়রামকে বলছেন, ওদেরকে চলে যেতে বল, তা নাহলে এক্ষুণি কাপড় ছেড়ে আমি দাঁড়িয়ে যাব। ওরা ভয়ে পালালো। সাধারণরা এই গ্ল্যামারের জন্য কাঙাল; কত খুশি হয়ে যেতেন, আমাকে এত লোকজন মানছে, জানছে।

যাঁরা বোঝেন যে আমার ‘আমি’ যাচ্ছে না, আমার এখনও নামযশের প্রতি আসক্তি যাচ্ছে না, আমার এখনও সুখভোগের প্রতি স্পৃহা, তাঁদের জন্য এই ভাবটাই ভাল —আমি ঠাকুরের সন্তান, আমি তাঁর দাস। আমরা এখানে সাধকদের কথা বলছি, সংসারীদের কথা বলছি না। দুঃখ-কষ্ট হলে বলবেন — হে ঠাকুর আমি তো তোমার সন্তান, কেন আমার এ-রকম হচ্ছে —এই ভাবটা; কারণ আমিত্ব আছে কিনা। এটা যে শুধু সাধকদের হয় তা না, যাঁদের একটু উচ্চ চিন্তা-ভাবনা আছে, তাঁরাও এই ভাব অবলম্বন করেন। একজনকে জানতাম, অনেকগুলো ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলেন, বয়স হয়েছিল। ওনাকে যখন বলা হচ্ছে, ‘আপনি একটা বিরাট ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তাই না? কিন্তু আপনাকে দেখে তো দুখী বা উদ্ভিগ্ন মনে হয় না’। উনি বলছেন, ‘আমি দুখী হলে আমার কি কোন সুবিধা হবে?’ ‘মনে হচ্ছে, ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে, আপনি কি একটুও চিন্তিত নন?’ উনি বলছেন, ‘আমি চিন্তিত হলে তাতে আমার কি কোন ভাল হবে?’ এই মনোভাব যে তাঁর বেদান্তের দিক দিয়ে হচ্ছে তা না, বুঝে গেছেন অযথা চিন্তা করে কোন লাভ নেই। গীতায় বলছেন, *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে*। তিনি বিচলিত হবেন না, কারণ এমন একটা অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁর কাছে সবটাই খড়কুটো; তাঁর মান-সম্মান সব কিছু খড়কুটো আর দুঃখ অপমান এটাও খড়কুটো।

প্রতিবেশী যিনি প্রশ্ন করেছেন, এমনি একটা উঠতি প্রশ্ন, কিন্তু ঠাকুর আচার্য। প্রশ্নকর্তা যেখানে আছেন, সেখান থেকে ঠাকুর তাঁকে ধরে সন্তর্পণে নিয়ে চলে যাচ্ছেন সেই পথে। ঠাকুর বলে দিলেন বেদান্ত কি, সেখান থেকে উনি ধরে টেনে নিয়ে তাঁকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তোমার জন্য বাপু এটা ভাল, তুমি এটাই কর —আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর ভক্ত।

**কলিযুগে ভক্তিয়োগই ভাল। ভক্তি দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়। দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি।** আমিত্ব থাকলেই দেহবুদ্ধি থাকবে, দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয় বুদ্ধি থাকবে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ — এই সকল বিষয়। বিষয়বুদ্ধি যাওয়া বড় কঠিন। বিষয়বুদ্ধি থাকতে ‘সোহহম’ হয় না। অত্যন্ত উচ্চমানের সাধক যাঁরা, বেদান্ত তাঁদের জন্য। যোগ আদি যেমন প্র্যাক্টিস করা যায়, বেদান্ত সেভাবে প্র্যাক্টিস হয় না। ভক্তিয়োগ, কর্মযোগ অনুশীলন করে করে প্রস্তুতি এনে অনেক উচ্চ অবস্থায় যখন চলে

আসেন, তারপরে বেদান্ত প্র্যাঙ্কিস হয়। সরাসরি বেদান্ত দিয়ে দিলে বদহজম হয়ে এ-কূল ও-কূল দুইই যাবে। বিষয়বুদ্ধি কার হবে? যার একটুও দেহবুদ্ধি আছে; আপনার খিদে বোধ হয়, জলতেষ্টি পায়? আপনি জানবেন আপনার দেহবোধ আছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এগুলোর প্রতি আকর্ষণ আছে? আপনার আকর্ষণ নেই যদি বলেন, বুঝতে হবে রোগের জন্য, বয়সের জন্য, শোকতাপাদির জন্য আপনি এখন নিরাহারী হয়ে গেছেন। নিরাহারী হয়ে গেলেই যে আপনার রসবোধ চলে গেছে, তা না। এই শরীরের পতন হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন আর-একটা শরীর হবে, আবার সব কিছু নূতন করে পুরোদমে এসে যাবে। সংসারে আছেন মানেই দেহবোধ থাকবে, দেহবোধ যাবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, তোমাদের জন্য ভক্তিপথই ভাল।

**ত্যাগীদের বিষয়বুদ্ধি কম, সংসারীরা সর্বদাই বিষয়চিন্তা নিয়ে থাকে, তাই সংসারীদের পক্ষে ‘দাসোহম’।** সন্ন্যাসীদের পক্ষে সাধন-ভজন করা খুব সহজ, নিজে এগিয়ে যদি ঝামেলা না ডেকে আনে, খাল কেটে কুমির যদি না আনে; সন্ন্যাসীদের কোন সমস্যা হয় না। ঠাকুর ত্যাগী সন্ন্যাসীদের নিয়ে বলছেন, তাঁরা তো বিরাট যুদ্ধটা জয় করে নিয়েছেন। সংসার ত্যাগ করলেই যে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছেন, তা তো না। সংসার ত্যাগ করে আপনি একটা আশ্রম বানিয়ে নিলেন। আশ্রম বানিয়ে নেওয়া মানে আপনি আবার একটা সংসার পাতলেন। মুখে বলা সোজা যে, আমার মনে ত্যাগ আছে, ও হয় না। আশ্রম না করে সংসার ছেড়ে আপনি একটা ফ্ল্যাটে থাকছেন, এখন সেখানকার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনাগুলো আপনাকে ঘিরে থাকবে। আমরা রামকৃষ্ণ মঠের লোক, মঠ আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, ওই দায়িত্বটুকু প্রাণ দিয়ে, পুরো নিষ্ঠা নিয়ে করে দিলাম; কিন্তু আমরা জানি, আমাদের এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আগেকার দিনে যাঁরা সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁদের এইটুকুও ছিল না; তিন দিন এখানে, পাঁচদিন ওখানে, এই করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। ফলে এনাদের বিষয়বুদ্ধি অনেক কম ছিল।

আপনারা মায়েরা যাঁরা সংসারে আছেন, মায়েদের সবাইকে সংসার চালাতে হয়। সেইজন্য মায়েরা কোন কিছু ফেলে দেন না। কোন প্যাকিং বাস্র, দড়ির টুকরো, প্লাস্টিকের ব্যাগ, কোন কিছু ফেলে দেবেন না, কারণ কখন কি দরকার পড়বে কোন ঠিক নেই। উদ্বোধনে টুকরি সমেত ফল-সবজি কেনা হত। একবার কেউ ফল সবজি রেখে টুকরিটা ফেলে দিয়েছিল। শ্রীশ্রীমা দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, ‘ওই টুকরিটা তুলে রাখ, ওরা সন্ন্যাসী ওদের লাগে না, ওরা ফেলে দেয়, আমাদের অনেক কিছু সামলাতে হয়, রেখে দাও পরে কাজে লাগবে’। ত্যাগীদের স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়বুদ্ধি কমে যায়। যার জন্য এনাদের সঙ্গে যাদের বন্ধুত্ব হয়, পরিচিতি হয়, বেশিদিন এনারা সম্পর্ক ধরে রাখতে পারেন না। এই যে বলছেন, সংসারীরা সর্বদাই বিষয়চিন্তা নিয়ে থাকে —উপায় নেই, এটা সংসারীদের way of life। সেইজন্য উপনিষদ আদিতে যদি কদাচিৎ কখন এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করেন, সেখানে ওনারা বলে দেন সংসারীরা কিভাবে সাধনা করবেন, বলেই ওই প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে সন্ন্যাসী, যাঁরা ত্যাগের পথ অবলম্বন করে আছেন, তাঁদের কথা বলতে শুরু করেন। সেইজন্যই তো বলা হয় — উপনিষদ ত্যাগীদের জন্য।

**প্রতিবেশী – আমরা পাপী, আমাদের কি হবে?**

**শ্রীরামকৃষ্ণ – তাঁর নামগুণকীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহবৃক্ষে পাপপাখি; তাঁর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের পাখি সব পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণকীর্তনে চলে যায়।**

পাপ নিয়ে আগেও আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের যতগুলো ধর্ম আছে, তাঁরা পাপকে দু-ভাবে দেখেন। এব্রোহামিক যত ধর্ম আছে, অর্থাৎ খ্রীশ্চান, মুসলমান, জুহুদি, তার সাথে পার্সিরা — এনাদের কাছে পাপ হল, ঈশ্বরের যে বিধান বা ঈশ্বরের যে আদেশ, তার অমান্য করা। জুহুদিরা এটাকে বলে কন্ট্রাস্ট, কভনেন্ট। সেই মোজেসের সময় থেকে, এব্রোহামের সময় থেকে ঈশ্বর কন্ট্রাস্ট করে

আসছেন—আমি তোমাদের এই এই দেব, বদলে তোমাদের আমাকে এই এই দিতে হবে। যদি এটা না মানা হয়, তখন সেটা হয়ে যাবে কথার খেলাপ। ভগবান তখন তাকে সাজা দেবেন—এটাকে বলে পাপ। খ্রীশ্চানিটিতে সরাসরি এটা নেই, কিন্তু প্রথমে দিকে জুহুদিরাই খ্রীশ্চানিটিতে এসেছিল, ওরা পাপের এই আইডিয়াকে নিয়ে খ্রীশ্চানিটির আইডিয়ার সাথে মিলিয়ে একটা জগাখিচুরি বানিয়ে সেটাকে নিয়ে পড়ে থাকল। সেইজন্য খ্রীশ্চানিটিতে পাপ ছাড়া কিছু থাকতে পারে না, তাদের কাছে পাপ ছাড়া মানুষ থাকতে পারবে না।

বিদেশে থাকার সময় একজন স্বামীজীকে বলছিলেন, ‘আপনাদের ধর্মে পাপ নেই বলছেন, তাহলে আপনাদের ধর্ম চলে কি করে’? ধর্ম নিয়ে ওদের যে কোন বিজ্ঞাপন দেখুন, এমন ভাবে দেখাবে—বিজ্ঞাপিত ওই জিনিসটা কতখানি দরকার আপনার। আগেকার দিনে বাজারে গেলে বিক্রেতারা ওভাবে বলত না, কখন-সখন চেষ্টা। রাষ্ট্রার ধারে দাঁড়িয়ে চেষ্টাবে—দশ টাকায় তিনটে, দশ টাকায় তিনটে। অনেক সময় লোকেরা দরকার না থাকলেও কিনে নিত। কিন্তু বর্তমানকালের বিজ্ঞাপনগুলো প্রথমে আপনার মনে এমন একটা ভাব তৈরী করে দেবে যে, মনে হবে আপনার এটা দরকার আছে। ধর্মও ঠিক এইভাবে বিজ্ঞাপন করে, তোমার দরকার আছে। কেন দরকার? কারণ তুমি জন্ম থেকে পাপী। যেদিন তুমি খ্রীশ্চান হয়ে জন্মেছ, সেইদিন থেকে তুমি পাপী। কারণ আদম আর ঈভ স্বর্গে কি একটা আপেল খেয়ে ফেলেছিল, সেখান থেকে তাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হল। মানুষ এসেছে আদম আর ঈভ থেকে, সুতরাং সমস্ত মানুষ জন্ম থেকে পাপী। ফলে তোমার ধর্মের দরকার আছে, তোমার চার্চের দরকার আছে, তোমার যীশুকে দরকার আছে। হিন্দুদের পাপ পুরো অন্য রকম। ইসলামে কোরাণে যা কিছু আছে, তার বাইরে গেলে তুমি পাপ করবে। হিন্দুদের এই সমস্যা নেই।

হিন্দুদের পাপ হল, আপনি বাচ্চা বয়স থেকে জেনে গেছেন, কি ঠিক, কি ভুল; এগারো বয়স হতে হতে আপনি সবটাই জানেন। মা-বাবা আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, সমাজ আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছে, আপনি যে ধর্মে আছেন, সেই ধর্ম আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। স্কুলে মাস্টারমশাইরা শিখিয়ে দিয়েছেন। এত জায়গা থেকে শিক্ষা পেয়ে সব মিলিয়ে মিশিয়ে মনে একটা ভাব তৈরী হয়েছে—এটাকে বলে ধর্ম ভাব, যেমন চুরি করতে নেই, মিথ্যা কথা বলতে নেই ইত্যাদি। আপনারা যে কজন শুনছেন, সবাই আপনারা জানেন চুরি করা পাপ, এটাও জানেন ভারতীয় পেনাল কোডে বলা হয়েছে, চুরি করলে আপনার শাস্তি হবে। ক্লাশ সেভেন এইটে যখন পরীক্ষা দিতেন, তখন পাশের সহপাঠীকে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করতেন কিনা, ‘এই এর উত্তরটা কি?’ আমার জানা নেই আপনারা করতেন কিনা, আমি কিন্তু করতাম। ধরা পড়লে শিক্ষকের হাতে মারও খেতাম, আবার পরীক্ষার খাতায় পাঁচ নম্বর মাইনাস করে দিতেন। তখনও জানতাম চুরি করা ঠিক না, পরীক্ষাতেও চুরি করা ঠিক না, কিন্তু তাও করতাম। আসলে কি হয়, আমাদের মনের মধ্যে যে ভাব আছে, সেই ভাব বলে দেয়—এতটুকু চুরি করা যায়, মনই বলে দেয়। সেটা নিয়ে যে মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ থাকবে তা না। পাপ কি, পূণ্য কি; শেষমেশ এটা আসে নিজের মন থেকে।

কিন্তু অন্যান্য ধর্মে কিছু সন্দেহজনক গোলমাল হলে ওনারা ওদের ধর্মগুরুর কাছে পাঠাতেন—এই এই হয়েছে, এতে দোষ হয়েছে কিনা বলে দিন। ওরা তখন ওদের নিজেদের নির্দিষ্ট ধর্ম-পুস্তক থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে একটা কিছু বলে দেন—এটাকেই বলা হয় ফতোয়া। আপনার মন বলে দেবে আপনি ঠিক না ভুল, এত কাঁচা কেন আপনি? আসলে কি হয়, যে ধর্ম তাদের গ্রন্থকে মেনে চলে, তাদের এই সমস্যাটা হয়। হিন্দুদের এই সমস্যাটা নেই। হিন্দুদের পাপ মানে ভুল। আমার মন জানে আমার কি করা উচিত, কি করা উচিত না। ভুল কাজ যখন করে ফেলি, মন তখন খুঁতখুঁত করে। কিন্তু অনেক দিন ধরে যদি ওই একই ভুল কাজ করতে থাকি, তখন পাপের প্রতি ঘেলাটা চলে যায়, খুঁতখুঁতানিটা আর থাকে না। তখন বুক ঠুকে বলে, ‘হ্যাঁ আমি করেছি, বেশ করেছি’। যখনই দেখবেন কেউ বলছে, ‘বেশ করেছি’, তখন বুঝবেন তার ওই পাপ বোধটা চলে গেছে। আমরা যে পাপবোধ বলছি, এটা আপনারা



সব সময় মনে রাখবেন, এই পাপবোধ হিন্দুদের আলাদা আর এব্রাহিমিক ধর্মের পাপবোধ আলাদা। ওদের পাপবোধ হল, ঈশ্বর যেটা আদেশ দিয়েছেন, সেটাকে অমান্য করা বা তার বিরোধিতা করা।

আমাদের এখানে ঈশ্বর কোন আদেশ দেন না। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কিছু জিনিস বলে দেওয়া হয়েছে—এ-রকমটি করবে, এ-রকমটি করবে না। যেমন রোজ সকালে স্নান করবে, স্নান যদি না করা হয় সেটাও পাপ। গুরু আপনাকে মন্ত্র দিয়েছেন, সকাল-বিকাল যদি মন্ত্র জপ না করেন তখন সেটাও পাপ। কিন্তু সেটা তো দোষ। আপনি যদি জপধ্যান না করেন, তাতে আপনারই ক্ষতি। যেটাতে আমার ক্ষতি হবে, সেটা করলে পাপ হতে যাবে কেন? আসলে এটাকে পাপ না বলে বলা হয় ভুল। এমনকি, আদম আর ঈভ, ওনারা যে স্বর্গের আপেল খেয়েছিলেন, যেটাকে খ্রীশ্চানরা আদি পাপ বলে, মুসলমানরা সেটাও বলে না, ওরা বলে গাফ্লা, গাফ্লা মানে ভুল হয়ে গেছে, গলৎ, mistake। ঠিক তেমনি আমরা যা কিছু করি, তাতে পাপ যেটা বলি, সেটা হল ভুল।

এখানে যে আলোচনাটা চলছে তা হল—আমি জানি যে এটা করা আমার উচিত না, কিন্তু তাও তো করতে ইচ্ছে করে। দুর্ঘোষনের নামে একটা প্রচলিত কথা আছে, দুর্ঘোষন বলছেন—আমি জানি ধর্ম কি, অধর্ম কি; কিন্তু ধর্ম করতে মন যায় না, অধর্ম থেকে মন সরতে চায় না। এটা মহাভারতের কথা না, পরে কেউ এটা রচনা করে মহাভারতের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এই কথা শুধু দুর্ঘোষনের কথা না, আমার আপনার সবার কথা। আমি জানি ধর্ম কি, আপনিও জানেন ধর্ম কি; আমিও জানি ভুল কি, আপনিও জানেন ভুল কি। কিন্তু ধর্ম সাধন করা, ঈশ্বরে মন দেওয়া, জপধ্যান করা, সংসার থেকে বিরক্ত হওয়া, বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য, এগুলো হয় না। এর বাইরে অন্যান্য যে দোষগুলো রয়েছে, আলস্য, কাম, ক্রোধ; এগুলো মনের মধ্যে থাকে। এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, এগুলো যে আমরা ইচ্ছা করে করতে চাইছি তা তো না।

এখানে ঠাকুর দেহকে বৃক্ষ রূপে বলছেন, বৃক্ষে যেমন পাখি বাসা করে, এই দেহবৃক্ষেও পাখি বাসা বাঁধে। এই যে কাম, ক্রোধ; বিশেষ করে কাম, এই কামের জন্য মানুষের দেহের প্রতি যে আকর্ষণ বা টাকা-পয়সার প্রতি যে আকর্ষণ, কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি এই যে আকর্ষণ, কামিনীকে সরিয়ে কাম আর কাঞ্চনের প্রতি যে আকর্ষণ; ঠাকুর এই জিনিসটাকে এখানে বেশি করে জোর দিচ্ছেন। এখানে করার থেকেও বেশি হল ইচ্ছা। পাপ নিয়ে যে এত কথা বলা হচ্ছে; আসলে ঠাকুর ইচ্ছাকে নিয়ে আলোচনা করছেন। তার জন্য বলছেন, হাততালি দিয়ে তাঁর নামগুণকীর্তন করলে দেহবৃক্ষের পাখি পালিয়ে যায়, তার মানে ওই ইচ্ছাটা নাশ হয়। তাহলে আগে আগে যে পাপ করা হয়েছে, সেগুলোর কি হবে? সেগুলো কর্মের গতির মত চলবে। সেখানেও বলছেন, ঠাকুরের নাম করলে ওই পাপ লাঘব হয়, তখন সেই পাপের আর জোর থাকে না, অল্পের উপর দিয়ে কেটে যায়। আপনারা যাঁরা এই কথা শুনছেন, আপনাদের মনে হবে, সত্যিই কি অল্পের উপর দিয়ে কেটে যাবে? ঈশ্বরের নামগুণগান করলে কি সত্যিই চলে যাবে? বা যেটা এখানে বলছেন, পাপের ইচ্ছাটা কি আদৌ চলে যাবে?

এখানে আবার বলে দিই, এখানে পাপ যেটা বলছেন, পুরনো পাপগুলো যায় না, ওটা থাকে, তবে জপধ্যান, তপস্যা করলে পুরনো পাপের জোরালো ভাবটা কমে যায়। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলছেন, *হেয়ং দুঃখমানাগতম্*, যে পাপ হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে; নূতন করে পাপ ডেকে এনো না। সেখানেও পতঞ্জলি কিন্তু একই কথা বলছেন। প্রকৃতিতে মন রাখা, এটাই পাপের মূল, দুঃখের মূল। প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেই আত্মা বা পুরুষে মন দিলে যে দুঃখগুলো আসেনি বা আসার অপেক্ষায় আছে, সেটাকে কাটিয়ে দেওয়া যায়। যে পাপগুলো এখনো ফল দেয়নি, ঈশ্বরের নাম নিলে সেগুলো চলে যায়। আপনারা যাঁরা বিশ্বাস করতে চান না, তাঁরা একবার করে দেখুন।

একটা সত্যিকারের ঘটনা পড়েছিলাম। এক ঠেলাওয়ালা সবজি বিক্রি করছিল। একজন মহিলা সেই ঠেলাওয়ালার কাছে এসে জিজ্ঞেস করছে, এই কড়াইশুটি কেমন? একটু দুটো শুটি ছাড়িয়ে খেয়ে

বলছে, কত দাম? একটা গাজর ভেঙে খেয়ে বলছে, এটা কত দাম? একটা মূলো ভেঙে খেয়ে বলছে, এর কি দাম? সেই সবজিওয়ালা বিরক্ত হয়ে গেছে, কিছু বলতেও পারছে না, কারণ খন্দের লক্ষ্মী, সবজি কিনতে এসেছে। ইতিমধ্যে মহিলাটা ঝাল লক্ষা দেখে জিজ্ঞেস করছে এগুলো কেমন? তখন ঠেলাওয়ালা বলছে, সব কিছু তো মুখে নিয়ে দেখছেন, এটাও মুখে দিয়ে দেখুন।

জীবনে আমরা সব কিছু একবার ট্রাই করে দেখে নিই। কাপড়ের দোকানে জামা-কাপড় পরে দেখার জন্য ট্রায়াল রুম থাকে। ট্রায়াল রুমে গিয়ে পোষাক পরে দেখে নিই জিনিসটা কেমন। গাড়ি কিনতে গেলে একটা ট্রায়াল রান দিয়ে দেখে নেয় গাড়ি কেমন। এটাও একটু ট্রাই করে দেখুন না। যে সমস্যা নিয়ে আপনি পড়ে আছেন, সমস্যা বলতে এখানে মনের কথা বলা হচ্ছে, পাপের কথা বলা হচ্ছে। আপনার বাড়িটা ঠিক করে নিতে চাইছেন, এখানে সেটার আলোচনা চলছে না। সাত দিন প্রার্থনা করুন, পনের দিন প্রার্থনা করুন, হৃদ এক মাস করুন, দেখবেন এগুলো চলে যাবে। আপনার ভিতরে যে পাপ, যে পাপবোধ; পাপ আর পাপবোধ, পাপবোধ মানে পূর্বকৃত কর্ম; আর পাপ হল, ভিতরে যে পুরনো সংস্কারগুলি আছে, যেগুলো আপনাকে ঠেলে পাপকর্ম করার ইচ্ছাকে জাগিয়ে দিচ্ছে, এগুলো সবটাই চলে যাবে, করে দেখুন। ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে, ঠাকুরের সামনে বসে, বেলেড় মঠের মন্দিরে ঠাকুরের কাছে এসে গর্ভগৃহের সামনে দশ পনের মিনিট বসে প্রার্থনা করুন। চোখের জল ফেলারও দরকার নেই, ফেলতে পারলে খুবই ভাল; হাতজোড় করে প্রার্থনা করুন, হে ঠাকুর আমার মনে এই জিনিসটা রয়েছে, আমাকে এই পাপকর্ম থেকে মুক্তি দাও। শরীরের যতটুকু চাহিদা, ততটুকু থাকবে, তার বেশি থাকবে না। কোন জিনিসের প্রতি যদি লোভ থাকে, মন যদি তাতে আটকে থাকে, দেখবেন সেটা চলে যাবে। নাতির প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, ছেলেমেয়ের প্রতি খুব আকর্ষণ, আপনি প্রার্থনা করুন, দেখবেন কেটে যাবে।

**আবার দেখ, মেঠো পুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়।** কি সুন্দর ভাব — মেঠো পুকুরের জল। আমাদের পাপ দিঘীর জল নয়, আমাদের পাপ হল মেঠো পুকুরের ওই সামান্য একটু জল। শরৎকালে গ্রামগঞ্জের কোন পথ দিয়ে যেতে যেতে আশেপাশের ডোবাতে, মাঠে প্রচুর জল জমে থাকতে দেখা যায়। উপর থেকে জানা যায় না ওখানে কত জল আছে। চৈত্র মাসে, বৈশাখে গিয়ে দেখছেন কোথাও কোন জল নেই, শুধু মাঠ দেখা যাচ্ছে, ডোবাগুলো খটখটে হয়ে আছে। মেঠো পুকুর, এক ফুট কি দেড় ফুট জল আছে, তার বেশি নেই। যেমনি গ্রীষ্মকাল আসে, শুকিয়ে খটখটে, কোথাও জল নেই। অন্যান্য ধর্মে, বিশেষ করে বিদেশী ধর্মে, ওদের পাপ হল দিঘীর জল, শুকিয়ে যাবার উপায় নেই। ওই পাপের ফল ভুগতে হলে ওদের নরকে যেতে হবে। নরকে গিয়ে নানান ধরণের সাজা পেয়ে, শাস্তি পেয়ে যদি পরিষ্কার হয়।

হিন্দুদের এই সমস্যা নেই, আমাদের সবটাই মনকে নিয়ে। মন সেকেগারি, আমরা বাস্তবিক ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের সঙ্গে এক; আমরা সেই শুদ্ধ আত্মা। শুদ্ধ আত্মা, এর উপর মনের যে ছাপ —এটা মেঠো পুকুর, জল বেশি নেই। যেমনি ঈশ্বরের নাম আসবে সব জল উবে যাবে। আর যেগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘকালের সংস্কার, সেটাও আস্তে আস্তে চলে যাবে। কিন্তু যদি বলা হয়, যাদের ব্লু প্রিন্টে দোষ আছে, তাদের কি হবে? এটা অন্যান্য ধর্মে হয়। হিন্দু ধর্মে ব্লু প্রিন্টে কক্ষণ দোষ হয় না। হিন্দুদের যে ব্লু প্রিন্ট, মূল যেটা, আমাদের যেটা মূল কাঠামো সেটা হল শুদ্ধ আত্মার। হিন্দুদের কোন দিনই পাপ হয় না। তাহলে ওদের কাছে কেন পাপ হয়? ওদের কাছেও পাপ হয় না, ওদেরকে পাপ বোধ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওরাও যদি এভাবে নেয়, ওদেরও পাপ কেটে যাবে। ঈশ্বর তো করুণাময়, ঈশ্বর তো ভালবাসার জিনিস, তিনি আমাদের ভালবাসেন, ভালবাসার জন তিনি কেন আমাদের পাপী বানাবেন? ওদের এই উল্টোপাল্টা কথাগুলোর আমরা কল্পনাও করতে পারি না। অবশ্য অন্য ধর্মের কথা আমাদের আলোচনা করা উচিত নয়, আমরা আমাদেরটা বলতে পারি। কোন বাচ্চা যদি কিছু ভুল কাজ

বা অন্যায় করে ফেলে, ও মনে করে কত বড় কিছু অন্যায় করে ফেলেছে। মা তখন বুঝিয়ে বলে দেন, বাবা! ও কিছু না, হয়ে গেছে, আর হবে না।

একটা ঘটনা আগেও আমি বলেছিলাম। সাধারণত কোন কাজ ছাড়া আমি কোন ভক্তের বাড়ি যাই না। একবার কোন কাজে এক পরিচিত বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওনাদের দু-আড়াই বছরের বাচ্চা টাওয়েল পরে আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছে। খেতে গিয়ে বোল বা ডাল ওর জামায় পড়ে গেছে। বাচ্চাটা এদিক সেদিক তাকাচ্ছে কেউ দেখতে পেয়েছি কিনা দেখছে। আমি সামনে ছিলাম, আমি দেখে যাচ্ছি। ওর এখন ভয় হচ্ছে মা আমাকে বকবে। ও সঙ্গে সঙ্গে কায়দা করে চামচ দিয়ে দই তুলল, দই তুলে ওটাকে পরিষ্কার করতে শুরু করেছে। কারণ ও দেখেছে, জামায় কিছু পড়লে মা জল দিয়ে ধুয়ে দেয়। এখন কাছে মা নেই, বোল পড়েছে, ওটাকে ধুতে হবে। কি দিয়ে ধোবে? দই দিয়ে ধুতে হবে। আমার দেখে খুব হাসি পেয়ে গেছে। আমি হাসছি কেন সবাই জানতে চাইল। আমি বললাম, ‘দেখুন আপনার বাচ্চা কি করছে, দই দিয়ে বোল পরিষ্কার করছে’। আমাদের এখানে পাপ, ওই একটা ছোট্ট দাগ লেগে গেছে। এখন সেটাকে পরিষ্কার করতে বিরাট কিছু করতে যাওয়ার মানে হয়—মশা মারতে কামান দাগা। এগুলো অন্যান্য ধর্মে দেখা যাবে, আমাদের ধর্মে এই সমস্যা নেই। আমাদের এই পাপগুলো মেঠো পুকুর। কিছু করতে হবে না, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, তীর্থে যেতে হবে না, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেই হয়ে যাবে, যেটা আগে বলা হল।

তেমনি তাঁর নামগুণকীর্তনে পাপ-পুষ্করিণীর জল আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়। এটা দিঘী না, পুকুর না, এটা পাপ-পুষ্করিণী, মেঠো পুকুরের জলের মত।

রোজ অভ্যাস করতে হয়। সার্কাসে দেখে এলাম ঘোড়া দৌড়াচ্ছে, তার উপর বিবি একপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত অভ্যাসে ওইটি হয়েছে। এটাও আগে আলোচনা করা হয়েছিল। কিছু দিন আগেই ঠাকুর সার্কাস দেখে এসেছেন। মায়েরা রান্না করেন, তাঁদের খুন্তি নাড়ার স্টাইলটাই আলাদা, আমরা কোন দিন পারবই না। আমরা খুন্তি ধরলে মনে হবে যেন একটা গদা ধরেছি, অভ্যাস নেই কিনা। কিন্তু করতে করতে অভ্যাস হয়ে যাবে।

আর তাঁকে দেখবার জন্য অন্ততঃ একবার করে কাঁদ। এটা সম্ভব না। ঠাকুর বলছেন ঠিক আছে, কিন্তু সম্ভব না, জীবনে একবার কাঁদলেও হবে। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক ঠাকুরকে চাইছেন, দেখা যাবে কখন না কখন তাঁর ঠাকুরের জন্য চোখ দিয়ে জল বেরোবে। কোন কষ্টের জন্য জল বেরোবে না, ভালবাসার জন্য জল আসবে। ঠাকুরের জন্য ওই চোখের জল যদি একবার বের হয়, সব ধুয়ে যাবে।

এই দুটি উপায় – অভ্যাস আর অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা। অভ্যাসটা হল, যেখানে স্বাভাবিক ভালবাসাটা নেই। যোগীরা অভ্যাস করেন, করতে করতে অনুরাগ হয়ে যায়। অনুরাগ এসে গেলে তখন আর অভ্যাস দরকার পড়ে না, চক্কিশ ঘন্টা অমনিই মনন চলতে থাকে। এই ব্যাকুলতা যখন এসে যায়, তখন আর অভ্যাস লাগে না।

ঠাকুর বেলঘরের গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে সকাল থেকেই আছেন। বৈঠকখানাবাড়ির দোতলা ঘরের বারান্দায় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রসাদ পাইতেছেন, বেলা ১টা হইয়াছে। সেবা সমাপ্ত হইতে না হইতে নিচের প্রাঙ্গণে একটি ভক্ত গান ধরিলেন – জাগ জাগ জননী, মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুলকুণ্ডলিনী।

ঠাকুর গান শুনিয়া সমাধিস্থ। শরীর সমস্ত স্থির, হাতটি প্রসাদপাত্রের উপর যেরূপ ছিল, চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিল। খাওয়া আর হইল না। অনেকক্ষণ পরে ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে

বলিতেছেন ‘আমি নিচে যাব, আমি নিচে যাব’। সমাধিস্থ অবস্থা থেকে কোন একটা জিনিসকে আধার বানিয়ে সেখান থেকে ঠাকুর আস্তে আস্তে মনটাকে নিচে নামিয়ে আনতেন।

একজন ভক্ত তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে নিচে লইয়া যাইতেছেন।

প্রাঙ্গনেই সকালে নামসংকীর্তন ও প্রেমামানন্দে ঠাকুরের নৃত্য হইয়াছিল। এখনও সতরঞ্চি ও আসন পাতা রহিয়াছে। ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট; গায়কের কাছে আসিয়া বসিলেন। গায়ক এতক্ষণে গান থামাইয়াছিলেন। ঠাকুর অতি দীনভাবে বলিতেছেন, ‘বাবু আর-একবার মায়ের নাম শুনব। গায়ক আবার গান গাহিতেছেন।

এখানেই ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের বর্ণনা শেষ হয়। এর পরের পর্বে আমরা আবার চলে যাব ২৫শে ফেব্রুয়ারি, তার মানে ঠিক পরের রবিবার।